লৌকিক-অলৌকিক

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

লৌকিক-অলৌকিক

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

pathagar.net

লা ল মা টি

Loukik-Aloukik
by
Sanjeeb Chattopadhyay

প্রথম প্রকাশ :
১ বৈশাখ ১৪১৭
এপ্রিল ২০১০

প্রকাশক :
নিমাই গরাই
লালমাটি প্রকাশনী
৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন : ২২৫৭ ৩৩০০

অক্ষরবিন্যাস :
লালমাটি
১২এ গৌর লাহা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

আলোকচিত্র সহ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
সৌরীশ মিত্র

মুদ্রণ :
নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস
৩১এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৭

দাম : ৪০ টাকা

pathagar.net

উৎসর্গ

বেলা মা-কে

pathagar.blogspot.com

PHONE : 2556-7500
INDEX NUMBER BI-019

Baranagore
Ramakrishna Mission Ashrama High School
37, GOPAL LAL TAGORE ROAD
KOLKATA - 700 036
INDEX NUMBER BI-019

No..................

ॐ

Date ৩/২/2006

লৌকিক - অলৌকিক প্রসঙ্গে

আপনার লৌকিক-অলৌকিক পড়ে আমরা অনেক কিছু নতুন তথ্য জানতে পারলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে আপনার ছোট বেলা থেকেই একটা অজানার প্রতি আগ্রহ। এই অজানাকে জানা মানে ঈশ্বরকে জানা। ঋষিরা বলছে যাকে জানলে সবকিছুই জানা যায় তিনি হলেন ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরকে জানার আগ্রহই আপনাকে বিখ্যাত সাহিত্যিক রূপে পরিণত করেছে। সেই সাহিত্যই সাহিত্য যার মধ্যে ঈশ্বরের কথা প্রকাশ পায়, আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়।

আপনি ধন্য, প্রভু আপনাকে মাধ্যম করিয়ে তাঁর কথা প্রচার করছেন। অন্তরালে রহিয়াছো মুরতি ধরি, রামকৃষ্ণ তোমায় প্রণাম করি। তিনি অন্তরালে থেকে আপনার মধ্যে থেকে প্রেরণা দিয়ে সবার কল্যাণ করছেন। যারা এই সুযোগ দিতে পারছে তারাও ধন্য।

স্বামী সুখানন্দ
(প্রধান শিক্ষক)

priyobanglaboi.blogspot.com

pathagar.net

সূচিপত্র

- ব্রহ্মদৈত্যকে একঘণ্টা গান শুনিয়ে ঠাকুরদা বাড়ি ফিরলেন ১৩
- তিল মাটিতে পড়া মাত্রই দপ করে জ্বলে উঠল ১৬
- মা বলে ডাকলেন, গগনভেদী চিৎকার ১৯
- বড়োমামা হতভম্ব, মনে মনে আওড়াতে লাগলেন, কৃপা, কৃপা ২২
- ছোটোদাদু ক্যানসার রোগটা নিজের শরীরে তুলে নিয়েছিলেন ২৫
- একটি ছবি, একটি ছবি। খসখস শব্দ ২৯

- সাঁইবাবা অলৌকিক শরীরে গোপীনাথ কবিরাজকে কাশীতে দেখে গেলেন ৩৪
- হঠাৎ দেখি চেয়ারে গৌরিদা, তারপরই নেই, টেবিলে শুধু শ্বেত শঙ্খ ৪০
- তোমার খুব বিপদ, বাঁচতে হলে এই মন্ত্র জপ কর বলেই গৌরিদা অদৃশ্য ৪৫
- 'একি তুমি এখানে!' প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে বেড়াচ্ছি ৫০
- আয়নায় দেখতে গিয়ে দেখি যন্ত্রণাক্লিষ্ট বৃদ্ধার মুখ ৫৪
- সিদ্ধ তান্ত্রিকের শব পুজো ছিন্নমস্তা, অমাবস্যায় রক্ত দিয়ে মায়ের পুজো করব ৫৮
- আমার কোনো নাম নেই। আমি মায়ের সন্তান, বলেই অদৃশ্য হলেন ৬২
- একটা ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল, গাছের ডাল ভাঙার শব্দ হল ৬৭
- বিনা মেঘে বজ্রপাত ৭১

অবিশ্বাস্য অলৌকিক নানা সত্য ঘটনার
কয়েকটি স্মৃতি রোমন্থন করেছেন
সুসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

pathagar.boiRboi.com

ব্রহ্মদৈত্যকে একঘণ্টা গান শুনিয়ে ঠাকুরদা বাড়ি ফিরলেন

আমার ছোটোদাদু সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ আমার বাবার ছোটোমামা মস্তবড়ো একজন তান্ত্রিক ছিলেন। তারাপীঠে তিনিই প্রথম বামদেবের মূর্তি সম্বলিত একটি মন্দির স্থাপন করেন। বামদেবের কালকুকুর কালুয়াও তাঁর পাশে আছেন। দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে বিস্তীর্ণ একটি জায়গায় সুন্দর এই আশ্রম ও দ্বিতল মন্দির। এই আশ্রমটির নাম 'বামদেব সঙ্ঘ'। মন্দিরের দ্বিতলে বামদেবের শয়নকক্ষ। সেখানে তাঁর ত্রিশূল, কমণ্ডলু, চিমটা ও বাঘছাল আছে। এখানে বসে গভীর ধ্যান করা যায়।

আমার ছেলেবেলা কেটেছে একটা হানাবাড়িতে। বাড়িটার খুব বদনাম ছিল। কিন্তু আমার পিতামহ ও পিতা ভূত-প্রেত বিশ্বাস করতেন না। আমার পিতামহ খুব শিক্ষিত ছিলেন। নামকরা শিক্ষক। বরাহনগরের মানুষ, যাঁরা প্রাচীন, তাঁরা যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামটি শুনলে কপালে হাত

pathagar.net

ঠেকিয়ে নমস্কার করতেন। আমার ঠাকুরদা ব্রহ্মদৈত্যকে গান শুনিয়েছিলেন। সেই সময়কার বরাহনগর, সিঁথি, দমদম, ঘুঘুডাঙ্গা— এইসব অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। চোর, ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে, ফাঁসুড়ে - কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। যা যা থাকা উচিত সবই ছিল। গোটাকতক খাল ছিল, তার মধ্যে একটার নাম দেঁতের খাল। এই খালটি দক্ষিণেশ্বরের পাশ দিয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। এরই কাছাকাছি একটি অঞ্চলকে বলা হত খোসালের মাঠ। এখানে প্রচুর ডাকাত ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার কলকাতা থেকে ফেরার পথে এদের পাল্লায় পড়েছিলেন।

আমার ঠাকুরদা জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশনে পড়তেন, বর্তমানে যার নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ। তিনি হেঁটে কলেজে যেতেন আবার সেইভাবে ফিরতেন। সেকালের মানুষ নিজের দুটি পায়ের ওপর যথেষ্ট ভরসা রাখতেন। কালীচরণ ঘোষ রোডের মুখে শীতলা মন্দিরটি খুবই প্রাচীন। এদিকে তখন বড়ো বড়ো বাগানবাড়ি ছিল। বড়ো বড়ো মানুষ সেইসব বাগানবাড়ির মালিক ছিলেন। যেমন প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিল্পপতি এফ এন গুপ্ত, ব্রাহ্মবেণী পাল। ঠাকুরদা খুব ভালো গান গাইতে পারতেন। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এদিকে-ওদিকে লণ্ঠন, কুপি জায়গায় জায়গায় জ্বলে উঠেছে। চারপাশে বড়ো বড়ো গাছ। বাদুড়রা রাতের চক্করে বেরিয়ে পড়েছে। শেয়ালরা প্রথম প্রহরের ডাক ডেকে গেছে। আমার ঠাকুরদা গান গাইতে গাইতে আসছেন। একতলা শীতলা মন্দিরের কাছে আসা মাত্রই মন্দিরের ছোট্ট ছাদ থেকে একটা ভারী গলা ভেসে এল— বেশ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে। ঠাকুরদা ওপর দিকে তাকিয়ে বিরাট এক পুরুষকে দেখতে পেলেন। গলায়

গোটা পৈতে। গান থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— আপনি কে? অন্ধকারে কী করছেন! উত্তর এল— আমি ব্রহ্মদৈত্য, এই গাছে থাকি। ঠাকুরদা এক ঘণ্টা বসে বসে গান শোনালেন আর সেই প্রেতের আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

তবু কী হল! এই ভুতুড়ে বাড়িতে এসে শুরু হল লাগাতার মৃত্যু। আমার ছোটোদাদু আর আমার বাবা দুজনেই সমবয়সি। ছোটোদাদু আমার ঠাকুরমার কাছেই মানুষ হয়েছেন। দুজনেই খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। আমার বাবাও যে তন্ত্রসাধক ছিলেন সেকথা জেনেছি বাবার পরলোকগমনের পর! মামা আর ভাগ্নে একসঙ্গে শক্তিসাধনা করতেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বেলতলায় সারারাত কাটত। ছোটোদাদু চলে গেলেন তারাপীঠে। মহাশ্মশানে সাধনভজন করে তিনি সিদ্ধ হলেন। শ্রদ্ধেয় সাধক তারাক্ষ্যাপা তাঁর গুরু। তন্ত্রসাধন করলে সিদ্ধাই হয়। একথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করে গেছেন। ছোটোদাদুরও অনেক সিদ্ধাই ছিল। তাঁর মধ্যে একটি হল— লোকের মুখের দিকে তাকিয়েই তাঁর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারতেন। গভীর রাতে যখন 'আসনে' বসতেন তখন তাঁর শরীর থেকে অদ্ভুত একটা জ্যোতি বেরত। আর তাঁকে ঘিরে নানা রকমের শব্দ হত। সেই শব্দ দূর থেকে শোনা যেত। যেমন খিলখিল হাসি, অনেক শকুনের খ্যা-খ্যা চিৎকার, কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খের শব্দ, মড়মড় করে ডাল ভাঙার আওয়াজ। সেইসময় ভয়ে সবাই দূরে সরে যেত। ধারে কাছে ঘেঁষত না। আমি একবার অমাবস্যার রাতে ছোটোদাদুর চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। দু-চোখে নীল আলো। আমি তখন স্কুলে পড়ি।

১২ পৌষ ১৪১৬, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৯

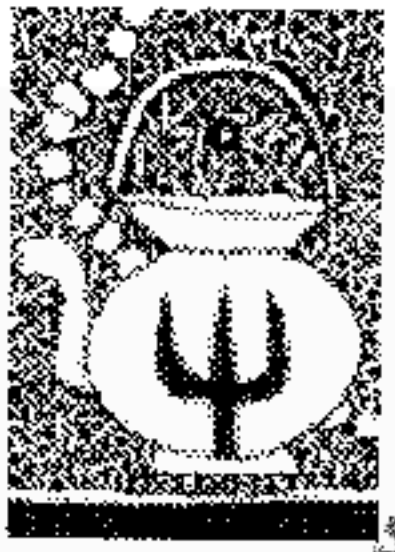

তিল মাটিতে পড়া মাত্রই দপ করে জ্বলে উঠল

pathagar.blogspot.com

ছোটোদাদু আমার বাবাকে বললেন— তোরা তো শুনলি না। এই বাড়িতে এসে আমার দিদি, আমার জামাইবাবু, আমার ভাগ্নীরা— একে একে সবাই তো মারা গেল। তুই আর তোর এই ছেলেটি শিবরাত্রির সলতের মতো জ্বলছিস। বাবা বললেন, আমি তোমার ভাগ্নে। তোমার মতোই সাহস রাখি। আমি শেষ দেখতে চাই। ছোটোদাদু খুব পান খেতেন, দুটো গাল সবসময় ফুলে থাকত। ওই পান ভেদ করেই কথা আসত। ছোটোদাদুর পোশাকটি ছিল ভারী সুন্দর। ধুতি, সিল্ক-টুইলের পুরো-হাতা শার্ট। একমাথা কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল। খুব লম্বা ছিলেন না। গায়ের রঙ ছিল পেতলের মতো। কিছুক্ষণ ভাবলেন। ভেবে বললেন— তাহলে আমাকেই নামতে হচ্ছে। দেখি আমার ঝুলিতে কী শক্তি আছে।

এসে গেল শনিবার। এবং অমাবস্যা। খবর এল আজ

রাতে ছোটোদাদু আসবেন, বিশেষ কিছু ক্রিয়া হবে। বাড়িটার ভেতরে উত্তরদিকে খানিকটা জমি ছিল। সেখানে বাবার বাগান। বড়ো গাছ, ছোটো গাছ সবই আছে। পূর্ব-দক্ষিণ কোণের একটা জায়গায় ছোটোদাদু অন্ধকারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। মাথার ওপর দোতলার বারান্দা। পূর্বদিকে সীমানা-পাঁচিলের পাশেই একটা টিনের চালা। ছোটোদাদু যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই জায়গাটায় আমরা কেউ যেতুম না।

এটাই মনে হত ওখানে পা দিলে মরে যাব।

এরপরে ছোটোদাদু তিনবার হাততালি দিলেন। আর মুখ দিয়ে শিসের মতো অদ্ভুত একটা শব্দ একটানা করে গেলেন অনেকক্ষণ। আমরা...। অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছি। ভয়ে সিঁটিয়ে। ঝোলা থেকে এরপর কালো তিল বের করে প্রথমে একটা জায়গায় ফেললেন। ঠোঁট দুটো নড়ছে অর্থাৎ মন্ত্র পড়ছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, তিলগুলো মাটিতে পড়া মাত্রই দপ করে জ্বলে উঠল। পাঁশুটে রঙের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ওপর দিকে উঠছে। ঠিক যেন ধূমাবতীর চুল। ছোটোদাদু যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন সেই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে তিল ফেলতে লাগলেন। যেখানেই ফেলছেন, সেখানেই আগুন জ্বলছে। আগুনের বলয়ের মধ্যে ছোটোদাদু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এরপরে যা ঘটল তা আজও ভুলতে পারিনি। আমার এই সাধক দাদু ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকলেন। উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। চেহারাটা হয়ে যাচ্ছে বিপুল। ওই জমিতে তিনবার পায়ের গোড়ালি ঠুকলেন। একটা শব্দ হল। যেন অনেকগুলো খাঁচা একসঙ্গে ভেঙে গেল।

পরের দিন সকালে ওই জায়গায় যে দৃশ্য দেখলুম তা

অবিশ্বাস্য বলেই মনে হতে পারে। বেশ বড়োমাপের গোল একটা হাড় পড়ে রয়েছে। সেই হাড়টার গায়ে চুল বেরিয়ে গেছে। ছোটোদাদু দেখে একটি কথাই বললেন— খতম।

এরপরে ওই বাড়িতে কোনো অকাল মৃত্যু, দুর্ঘটনা, রাতের বেলায় ভীতিপ্রদ আওয়াজ, দপদপ করে হ্যারিকেনের আলো নিভে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি।

১৩ পৌষ ১৪১৬, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯

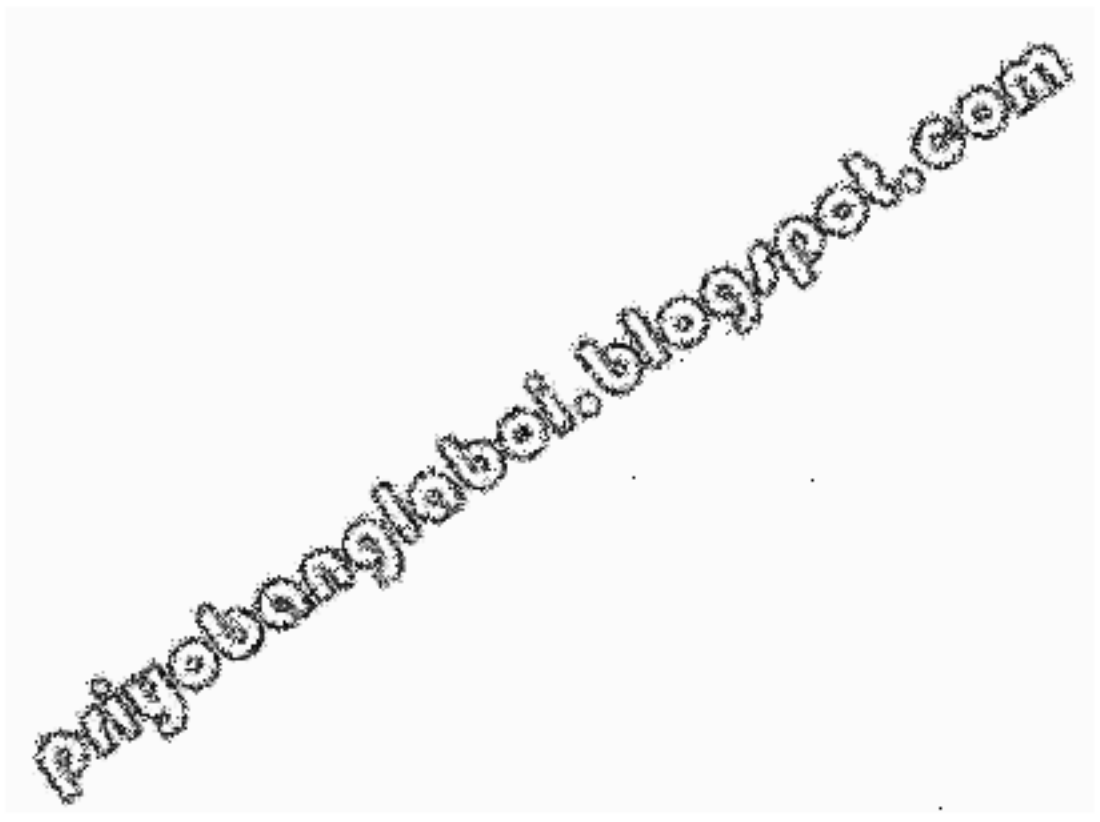

মা বলে ডাকলেন, গগনভেদী চিৎকার

কামারহাটি এলাকাটা জুটমিলের জন্য বিখ্যাত। আর যেখানে জুটমিল, সেখানেই তৈরি হয় ঘন বসতি। বিভিন্ন প্রদেশ ও ধর্মের মানুষ এক জায়গায় এসে পাশাপাশি বাস করেন। জুট মিলের ডাক্তারখানাও থাকে। বিখ্যাত ডাক্তার এস কে বন্দ্যোপাধ্যায় এখানকারই একটি জুটমিলের মেডিকেল অফিসার। তাঁরই অধীনে কাজ করতেন আমার বড়োমামা সুধাংশু মুখোপাধ্যায়। তিনি একবার ঘোরতর অসুস্থ হয়েছিলেন। কোনো ডাক্তারের ক্ষমতা ছিল না তাঁকে সুস্থ করার। অদ্ভুত ধরনের অসুখ। যার ৯০ ভাগই সাইকোলজিক্যাল। সমস্ত কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল। সেই সময় আমার ছোটোদাদু বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর বিশাল গোল টেবিলে একটা ঘুসি মেরে বললেন, দেখা যাক কী করা যায়। বড়োমামাকে নিয়ে চলে গেলেন তারাপীঠে। বামদেব

সঙ্ঘের ঘরে ছোটোদাদু আর বড়োমামা। তারামায়ের মন্দিরের বিখ্যাত শক্তি পাণ্ডাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, একটু চেষ্টা করে দেখা যাক মায়ের কৃপা হয় কি না।

বড়োমামার অবস্থাটা তখন এইরকম, ঘড়ির টিকটিক শব্দের মতো তিনি তাঁর ভিতরে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। যাকে পাচ্ছেন, তাকে আঁকড়ে ধরে বলছেন, আমি এখনই মরে যাব, তোমার কাছে কোনো ওষুধ আছে? এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছেন না, অনবরত কাঁদছেন। ছোটোদাদু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, আর মুচকি মুচকি হাসছেন। শক্তি পাণ্ডাকে ছোটোদাদু বললেন, কাল সকালে তুমি মায়ের মন্দিরে এই সুধাংশুকে নিয়ে বসবে। হোম, যাগ-যজ্ঞ যা করার সব করবে। আমি এদিকে বামদেবের মন্দিরে বসব। বড়োমামার ছোটোদাদুকেই পছন্দ। শক্তি পাণ্ডাকে সহ্য করতে পারছেন না।

ছোটোদাদু বললেন, তুমি যা চাইছ তাই হবে, ও আমার নির্দেশ মতো পুজোটাই শুধু করবে।

ছোটোদাদু ঢুকলেন বামদেবের মন্দিরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি ভেতরে কী করছেন, কিছুই বোঝার উপায় নেই। মন্দিরের কাজ শেষ হল। শক্তি পাণ্ডা বড়োমামাকে নিয়ে বামদেবের মন্দিরের সামনে এসে অপেক্ষা করছেন। এমন সময় দরজা খুলে গেল। ছোটোদাদু বেরিয়ে এলেন। পুজোর পোশাক। অনাবৃত প্রশস্ত বুকে সাদা পৈতে শুয়ে আছে। মুখ-চোখ জবাফুলের মতো লাল, পরিধানের কাপড়ও লাল। তাঁর হাতে দুলছে একটি কবচ। একটাও কথা নেই মুখে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। বড়োমামার ডান হাতের উপর বাহুতে সেই কবচটি পরিয়ে দিয়ে মা বলে ডাকলেন। গর্জনভেদী

চীৎকার। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে অচেনা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। কবচটা পরিয়ে দিয়ে বড়োমামার বুকে আলতো করে একটা ঘুসি মেরে বললেন, যাও তুমি ভালো হয়ে গেছ। যাও মাকে প্রণাম করে এস। কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকে বড়োমামা লাফিয়ে উঠলেন, আমি ভালো হয়ে গেছি। আমি ভালো হয়ে গেছি। সত্যি, বড়োমামা ভালো হয়ে গেলেন। সেদিন বামদেবের মন্দিরে বহু মানুষকে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হল। ছোটোদাদু বললেন, পরিবেশন করবে সুধাংশু। সুধাংশু তাই করলেন।

১৪ পৌষ ১৪১৬, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯

বড়োমামা হতভম্ব, মনে মনে আওড়াতে লাগলেন, কৃপা, কৃপা

আমার বড়োমামা সুধাংশুবাবু, জুটমিলের ডিসপেনসারিতে কাজ করতেন। রোজ সকালে অক্ষিতকে জহুরকে রেখে ঝট করে একবার বাজার ঘুরে আসতেন। এটা করা উচিত নয়, তবুও করতেন। সেদিন জুটমিলের এক শ্রমিক বয়লারে কাজ করতে গিয়ে আহত হলেন। তাঁকে সবাই মিলে নিয়ে এসেছেন ডিসপেনসারিতে। তখন বড়োমামা নেই। এদিকে মানুষটির অবস্থা শোচনীয়। ব্লিডিং হচ্ছে। কী করা যায়! ওই অক্ষিতই ডাক্তার হয়ে গেল। সে আধ ফাইল টিংচার অ্যামোনিয়া লোকটিকে খাইয়ে দিল। যা অল্প মাত্রায় খেলে যন্ত্রণা কমে, একটু ঝিমুনি ভাব আসে। সে এতটাই খাইয়েছে যে আহত মানুষটি এক ঝটকায় অজ্ঞান। শুধু অজ্ঞান নয়, পেট ফুলছে। ফুলতে ফুলতে ধামার মতো হয়ে গেল। সেই সময় বড়োমামা এলেন। সব দেখেশুনে অক্ষিতকে জিজ্ঞেস

করলেন, কী দিয়েছিস ? সে ওই শিশিটি দেখাল। বড়োমামা জিজ্ঞেস করলেন, কতটা দিয়েছিস ? সে বলল, আধ শিশি।

রোগীকে সাগর দত্ত হাসপাতালে পাঠানো হল। বড়োমামা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। রোগী যদি মারা যায়, পোস্টমর্টেম হবে, তখনই দেখা যাবে তাকে বিষাক্ত কিছু খাওয়ানো হয়েছে। কে খাইয়েছে ? ডাক্তার খাইয়েছে। ডাক্তার তখন কোথায় ছিলেন ? তিনি বাজারে গিয়েছিলেন, অদক্ষ এক সুইপারের হাতে ডিসপেনসারির ভার দিয়ে। চাকরিটা তো যাবেই, হাজতবাস অবধারিত। কে রক্ষা করবে এই বিপদ থেকে !

বড়োমামা সব ফেলে ছুটে এলেন তাঁর গুরু সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। অসময়ে বড়োমামাকে দেখে তিনি কিছু বলার আগেই মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বললেন, কিছু পাবে না, আর ওই লোকই কাল সকালে এসে তোমাকে স্যালুট করবে। বড়োমামা অবাক হয়ে বললেন, আপনি জানলেন কী করে ? আমি তো এখনও কিছু বলিনি ! ছোটোদাদু আরও একটু হেসে বললেন, বাবা, শিষ্যের ভার যখন নিয়েছি, তখন সব কিছু দায়িত্ব তো গুরুকে নিতেই হবে। শিষ্যের কৃতকর্মের ফল গুরুকেই ভোগ করতে হয়। ওরা পেটে পাম্প নামবার আগেই আমি নেমে সমস্ত বিষটা তুলে নিয়েছি। এই দেখ আমার জিভ। বড়োমামা দেখলেন গুরুদেবের জিভের রং ঝুল কালো। তুমি যাও, কিচ্ছু ভেব না। যা করার আমি করছি।

শিষ্যের তবুও কি বিশ্বাস হয় ! সাধন পথে সন্দেহই এক মহাশত্রু। ফিরে গেলেন সাগর দত্ত হাসপাতালে। সেখানে একদল শ্রমিক। তাঁদের হাবভাব মারমুখী। খারাপ

খবর এলেই শুরু করে দেবে 'অ্যাকশন'। বড়োমামা একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে আসার সাহস নেই। এমন সময় খবর এল, পেটের ফ্লুইডে কিছুই পাওয়া যায়নি। ফুলো কমে গিয়েছে। চেঁচি লাগার চিকিৎসা শুরু হয়েছে।

পরের দিন সকাল। বড়োমামা ডাক্তারখানায় বসে আছেন। হঠাৎ দেখছেন, বাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে গটগট করে ডিসপেনসারিতে ঢুকছে। ছোটোদাদু ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, বীরের ভঙ্গিতে বড়োমামাকে স্যালুট করে বলছে, আমি একদম ভালো হয়ে গেছি সাব। একদম ফিট। বড়োমামা হতভম্ব। বুক পকেট থেকে গুরু সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিটি বের করে কপালে ঠেকালেন। এই প্রথম প্রভু বলে সম্বোধন করে মনে মনে আওড়াতে লাগলেন-- কৃপা, কৃপা।

১৪ পৌষ ১৪১৬, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯

ছোটোদাদু ক্যানসার রোগটা নিজের শরীরে তুলে নিয়েছিলেন

ছোটোদাদুর বৈঠকখানা ছিল দেখার মতো। বড়োলোকের বাড়ি, বিরাট যৌথ পরিবার। বাড়ির সামনেটা ইতালিয়ান ঢঙে তৈরি। সেই বাড়ির জন্য এখনও আমার ভেতর একটা বেদনা বোধ জেগে ওঠে। উঁচু ভিতের ওপর তৈরি। সাত ধাপ সিঁড়ি বেয়ে একটা রক। পরপর তিনটি প্রবেশ দ্বার। বিশাল বড়ো একটা বৈঠকখানা। সেই বাড়িটা না দেখলে স্থাপত্য কৌশলটা বোঝা যাবে না। যাক সে কথা। কিছুই থাকবে না, এটাই যেন বাঙালির নিয়তি।

বৈঠকখানার ঘরের মাঝখানে বিশাল একটা গোলটেবিল। সেই টেবিলটা ছেলেবেলায় দেখে আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম, এইটাই লন্ডনের রাউন্ড টেবিল। এই বাড়িতেই, এই টেবিলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এসে বসেছিলেন। তখন তিনি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী নন। নামকরা একজন ডাক্তার। এই বাড়ির পূর্বপুরুষও একজন বিখ্যাত ডাক্তার।

ডাক্তার রায় এই বাড়িতে বসেই ব্যারাকপুর নির্বাচন কেন্দ্রে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বিপরীতে নির্বাচন অভিযান পরিচালনা করে জয়ী হয়েছিলেন।

গ্রীষ্মকাল, ৪টে। ছোটোদাদু দোতলা থেকে নেমে এসে ওই টেবিলে বসলেন। ইতিমধ্যে ঘরে অনেক লোক। তাঁরা ভাগ্য জানতে এসেছেন। একসঙ্গে সকলেই হুড়মুড় করে কথা শুরু করলেন। ছোটোদাদু যখন হাসতেন, মনে হত আকাশ খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ছে। আর যখন গম্ভীর হয়ে থাকতেন, মনে হত এখনই যেন বজ্রপাত হবে। সেই মুহূর্তে তিনি ভীষণই গম্ভীর। একটা আঙুল তুলতেই ঘর নিস্তব্ধ। তিনি বললেন, একজন আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি। বরাহনগর বাজারে বাস থেকে নেমেছে। নন্দকুমার রোড ধরে সে আসছে।

এইকথা বলতে বলতে সুন্দর চেহারার এক যুবক ঘরে ঢুকলেন। প্রণাম করার জন্য নিচু হতেই ছোটোদাদু বললেন, মুখ দিয়ে কাশির সঙ্গে রক্ত বেরলেই টিবি হয় না। অন্য কারণও থাকতে পারে। সেই ছেলেটির চোখেমুখে ভীষণ একটা আশ্চর্যের ভাব। তিনি তখনও কিছু বলেননি। ছোটোদাদু বললেন, এখানে বস। যুবকটি কিছু বলতে চাইছিলেন। ছোটোদাদু বললেন, তোমার ভাবনাটা আমি বইয়ের মতো পড়তে পারছি। কথা বলে কোনো লাভ নেই। দ্যাখ, পৃথিবীর দুটো দিক— লৌকিক আর অলৌকিক। এই দেহটা নিয়ে যা জানতে পারি, তাকেই বলে লৌকিক। আর দেহের ভেতর যে সূক্ষ্মদেহ সে দেখে, তাকেই বলে অলৌকিক। এইবার দেখ, এই যে দেখছ বুড়ো আঙুলটা, এটা আমি তোমার কণ্ঠনালিতে একবার ঠেকিয়ে দিলুম। কাল এসে জানাবে কেমন আছ।

যুবকটি আজ সম্পূর্ণ সুস্থ প্রবীণ একজন মানুষ।

আমারই ভাই দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছে ছোটোদাদুর বহু কথা সঞ্চিত আছে। ঝাড়লে একটা বই হয়ে যাবে।

এতদিন পরে সময় সময় নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করি, তুমি কি তোমার ছোটোদাদুর মৃত্যুর কারণ? আমাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। আমার সম্পর্কে তাঁর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী একের পর এক ফলেছে। এখনও হয়তো কিছু বাকি আছে। সেইটাই হবে আমার শেষ পাওনা।

সেই সময়, অর্থাৎ ১৯৭০ কী '৭২ সালেই আমারই পরিচিত কলকাতার এক বিশিষ্ট মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হলেন। বড়ো ব্যবসায়ী। ইলেক্ট্রিক্যালসের এজেন্ট ছিলেন। বড়ো বড়ো হাউসে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজকর্মও করতেন। ধনী মানুষ, উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। আমি মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে যেতাম। দোতলার ঘরের বিছানায় শুয়ে থাকতেন। তখন ক্যানসার হলে কিছুই আর করার থাকত না। গলা বুজে গেছে। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরেই তাঁর দু-চোখে জল নামত। ভীষণ সাহসী মানুষ ছিলেন। আশি মাইলের কম স্পিডে গাড়ি চালাতেন না। তাঁর স্ত্রী আমাকে বললেন, বিল্টু কী করা যায় না!

আমার তো একমাত্র সহায় ছোটোদাদু। তাঁকে বললুম, কী করা যায়? কিছুক্ষণ ভাবলেন। এরপর তিনবার বামদেবের নাম উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা চল দেখি কী করা যায়। এখনও মনে আছে, একদিন সন্ধ্যার মুখে তাঁকে নিয়ে সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে গেলুম। তিনি রুগির ঘরে ঢুকে সকলকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। আমিও বাইরে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন। সেই পরিবারের সমস্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য

করে নেমে এলেন রাস্তায়। একটা গাড়ি ছিল, উঠে বসলেন। আমি পাশে। চালককে বললেন, কালীঘাটে চল। মাকে প্রণাম করলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে মন্দির থেকে নামতে নামতে বললেন, আমার সব বিদ্যা তোমাকে দিয়ে যাব। তখন বুঝিনি কেন বললেন!

ছোটোদাদুর থ্রোট ক্যানসার হল। তখনও বুঝিনি কেন হল। এখন বুঝেছি, তিনি রোগটা নিজের শরীরে তুলে নিয়েছিলেন। কারণ সেই ভদ্রলোক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আরও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন।

১৫ পৌষ ১৪১৬, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯

pdfyobengaliboi.blogspot.com

একটি ছবি, একটি ছবি।

খসখস শব্দ

আমি তাঁকে এস কে বোস নামেই চিনতাম। কলকাতার এক সম্পূর্ণাঙ্গ বনেদি মানুষ। বোধহয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত পরিবারের সঙ্গে দূর আত্মীয়তা ছিল। পাক্কাসাহেব। প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা। নিখুঁত ইংরেজি পোশাক। থ্রি-পিস স্যুট, টাই। টাই ছাড়া আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। দু-খানা গাড়ি ছিল। একটা সানবিম। তার হুডটা খোলা যায় আবার তোলাও যায়। আর একটা অস্টিন। এত বড়ো মিশুকে ও উপকারী মানুষ আমি দেখিনি। কলকাতায় তখন সব কিছুর আকাল। বেবি ফুড, পাউরুটি এইসব সামান্য সামান্য জিনিসও দুষ্প্রাপ্য। তিনি তেল পুড়িয়ে আমাদের বরাহনগরের বাড়িতে কখনও রুটি, কখনও বেবি ফুড পৌঁছে দিয়ে যেতেন। তখন বাড়িতে একটা বেবি এসেছে। বেবি ফুড ছাড়া অন্য কোনো দুধের কথা ভাবাই যেত না। কারণ খাটালের গোরুর দুধ শিশুকে

দেওয়া যায় না। তিনি কখনও কখনও আমাকে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের একটি বিখ্যাত বনেদি দোকানে চা খেতে যেতেন। সেই দোকানটি ছিল চা, কেক, স্ন্যাকস ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত।

এই বোসসাহেব একদিন আমাকে বললেন, আপনাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব, আপনি ভাগ্য, জ্যোতিষী এইসব মানেন, আপনার নিজেরও চর্চা আছে। আপনার ভালো লাগবে। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তখন কে ছিলেন, নামটা ভুলে গেছি। তাঁর বাড়িতে এক তন্ত্রসাধক এসেছেন। তিনি সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ান। জেট সেট গুরু। আজ জার্মানিতে তো কাল আমেরিকায়। ত্রিকাল সিদ্ধ। ভূত, ভবিষ্যৎ, বতর্মান— তাঁর হাতের মুঠোয়।

এক বিকেলে সেই চেয়ারম্যান সাহেবের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির। জুতোর সংখ্যা দেখেই বুঝতে পারলুম প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। তন্ত্রসিদ্ধ সেই সাধকটি তিনতলায় আছেন। তিনি মাঝে মাঝেই কলকাতায় আসেন। চেয়ারম্যান সাহেব তিনতলার ফ্ল্যাটটি তাঁর জন্যেই রেখেছেন। খুবই সুন্দর। বড়ো হলঘর, শোবার ঘর, লেখাপড়া করার ঘর, করিডর। দামি কার্পেট মোড়া। দেখলুম বোসসাহেবের খুব হোল্ড। আমাকে নিয়ে সোজা গুরু যে ঘরে রয়েছেন সেই ঘরে ঢুকলেন। ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট। সুন্দর, সুন্দর ডিভান। ভারী সিল্কের পর্দা।

প্রথম বিস্ময়— গুরুজি একটু হেলে বসে আছেন। পাশে, ওপাশে সিল্কমোড়া বালিশ। গদিটা এত নরম যে তাঁর দেহের নীচের অংশ ভেতরে ডুবে গেছে। অবাক হওয়ার কারণ— কোনো মানুষের এইরকম গায়ের রঙ দেখিনি— হালকা নীল। চোখ দুটো রুবি রেড। ছোট্ট

একটি মানুষ। পরে শুনেছিলাম, ওঁর হাতের ও পায়ের আঙুলের সংখ্যা ছয়, ছয়। দু-হাতে বারো, দু-পায়ে বারো। ভয়ে ভয়ে কার্পেটের ওপর বসলুম। বোসসাহেব প্রণাম করলেন, আমিও প্রণাম করলুম। ভক্তির চেয়ে ভয়ই বেশি হল। শুনলুম ভারতবর্ষে যত রাজা-মহারাজা আছেন সবাই এঁর ভক্ত। অনেকে শিষ্যত্বও স্বীকার করেছেন। জানি না ইনি কী সাধন করান। নিজে তো কাপালিক।

বোসসাহেব বললেন, বাবা, এই ছেলেটি কিছু জানতে চায়। তিনি বললেন, কী জানতে চাও? ভবিষ্যতে কী হবে তাই তো? আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি বললেন, পাশের ঘরে চলে যাও, টেবিল, চেয়ারে বসো, ওখানে প্যাড আছে, কলম আছে। তোমার তিনটে মূল প্রশ্ন কাগজে লিখে আমার এই সহকারীকে দাও। পাশের ঘরে গিয়ে তিনটি প্রশ্ন লিখলুম। সেই ভদ্রলোক আমাকে বললেন, তিন ভাঁজ করে এই লম্বা খামে ভরুন। মুখটা আঠা দিয়ে জুড়ুন। সেই ভদ্রলোক খামটাকে গালা দিয়ে সিলমোহর করলেন। আমি ভাবছি বাবা, কী ব্যাপার! খামটা হাতে নিয়ে গুরুজির কাছে এলুম। পরবর্তী আদেশ, ওই পাশের ঘরে যাও। সেখানে আমার গুরুর ছবি রয়েছে। সেই ছবির পায়ের কাছে রেখে চলে এস।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখলুম, কাঠের বেদি, একটি বড়ো ছবি, ফ্রেমে বাঁধানো। অদ্ভুত চেহারার এক সাধক। এঁদের দেখছি সবই অদ্ভুত। অনেক ফুল, ফুলের মালা। আমি ভয়ে ভয়ে খুব সাবধানে লম্বা খামটি পটের তলায় রেখে বেরিয়ে এলুম। সহকারী দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ওই ছবি ও ছবির তলায় খামটি ছাড়া আর কিছুই রইল

না। আমি গুরুজির ঘরে এসে বোসসাহেবের পাশে বসলুম।

নানারকম কথা হচ্ছে, অনেক ভারী, ভারী লোকজন আসছেন। ঝুড়ি, ঝুড়ি ফল ও মিষ্টি আসছে। আমরাই কেবল খালি হাতে এসেছি। কিছুক্ষণ পরেই যে ঘরে পট রয়েছে সেই ঘরে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। গুরুজি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও তোমার উত্তর এসে গেছে নিয়ে এস। ধীরে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলুম। দেখলুম খামটা মেঝেতে পড়ে আছে। তুলে নিয়ে গুরুজির ঘরে এলুম। তিনি বললেন, দেখে নাও। খামটা কেউ খোলেনি। সিলমোহর যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। ইনট্যাক্ট। তিনি বললেন, খুলে দেখ, কী উত্তর এসেছে। খামটা খুললুম। আমি যে প্রশ্ন লেখা কাগজটা ভরেছিলুম সেইটার সঙ্গে পরিষ্কার বাংলায় তিনপাতার একটা উত্তর। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর এসেছে। শুধু তাই নয় লাল একটা পাথরও এসেছে। নির্দেশ— এটি ধারণ করো, তোমার ভালো হবে। আমি এতটাই অবাক হয়েছি কথা বলতে পারছি না। বুঝে উঠতে পারছি না কীভাবে কী হল! আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। বললুম, আমাকে আপনার গুরুদেবের একটা ছবি দেবেন? তিনি বললেন, দেওয়ার মালিক তো আমি নই। আমি কিছুই নই। সামান্য এক ভৃত্য। তাঁর কৃপায় বেঁচে আছি। তাঁর কৃপাতেই তোমরা আমার কাছে আসছ। আবার ওই ঘরে যাও পটের সামনে বসে চোখ বুজিয়ে প্রার্থনা কর, তোমার আবেদন জানাও। আবার সেই ঘরে। দরজা বন্ধ করে পটের সামনে বসলুম। চোখ বুজিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকলুম।— একটি ছবি, একটি ছবি। খসখস শব্দ। চোখ মেলে তাকালুম। আমার সারা গায়ে

কাঁটা দিয়ে উঠল। ছবির তলা থেকে সাদা মতো কী একটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। গোটা কতক ফুল মেঝেতে পড়ে গেল। সেই সাদা বস্তুটি ছিটকে বেরিয়ে এসে মেজেতে পড়ল। একটি ছবি। পটের ছবিরই ছোটো সংস্করণ। হাতে তুলে নিয়ে কপালে ঠেকালুম। সারা শরীর কাঁপছে। দুর্ভাগ্য আমার, সেই মহাপুরুষের নামটি আমি মনে রাখিনি।

১৬ পৌষ ১৪১৬, ১ জানুয়ারি ২০১০

pathagar.blogspot.com

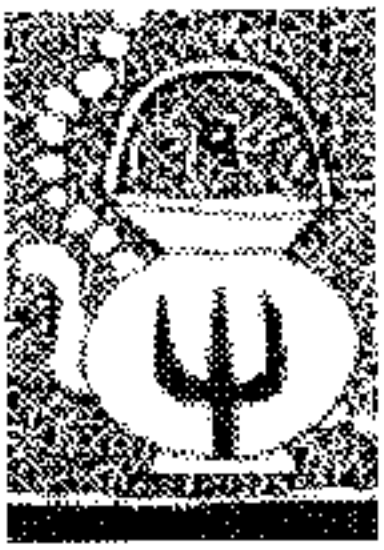

সাঁইবাবা অলৌকিক শরীরে গোপীনাথ কবিরাজকে কাশীতে দেখে গেলেন

আমি যখন সরকারি চাকরি করি, তখন এক আধ্যাত্মিক মানুষ হরলাল ভট্টাচার্য আমাদের দপ্তরে উচ্চপদে ছিলেন। অমন সুন্দর চেহারার মানুষ খুব কম দেখা যায়। প্রাথমিক সামান্য তিক্ততার পর আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি খুব লিখতে ভালোবাসতেন। অনেক কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবিতা আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলুম। অক্সফোর্ড থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল— 'Know Thyself'। প্রখ্যাত আই সি এস হিরন্ময় ভট্টাচার্য বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন।

হরলালবাবু একদিন আমাকে বললেন, তোমাকে নিয়ে আমি কাশীতে যাব। কাশী দর্শন তো হবেই, আর একটা খুব বড়ো কাজ আমাদের করতে হবে। তখনই জানলুম পণ্ডিতপ্রবর শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর গুরু। গোপীনাথজিকে বলা হত 'কাশীর চলমান শিব'। তাঁর

রচনাবলি পড়লে বহু অলৌকিক ঘটনার কথা জানা যায়। তিনি উপাধি পেয়েছিলেন মহামহোপাধ্যায়। কাশীতেই তাঁর জীবন কেটেছে। বেনারস সরকারি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর শেষ চাকরি। গোপীনাথজি তখন গঙ্গার ধারে আনন্দময়ী মার সুন্দর আশ্রমের দোতলায় রয়েছেন। মাই তাকে নিয়ে এসেছেন।

হরলালবাবু বললেন, তিনি যে ঘরে রয়েছেন, সেই ঘরের একপাশে তুমি চুপ করে বসে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমিও থাকব। তুমি সব দেখবে আর মনে মনে নোট করবে। তোমাকে লিখতে হবে। প্রথম দিনের কথা বেশ মনে আছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বাঁদিকে মাঝারি মাপের একটি ঘর। টানা লম্বা বারান্দা। শেষ হয়েছে গঙ্গার উপর একটি নাটমন্দিরে। তলায় বয়ে চলেছেন মা গঙ্গা। এপাশে ওপাশে, যেদিকেই তাকানো যাক অবারিত দৃষ্টি। সামনের গঙ্গায় কত কী ঘটে চলেছে। ভারী সুন্দর জায়গা। গোপীনাথজি দরজার দিকে মুখ করে একটি তক্তপোশে বসে আছেন। পরনে শুধুমাত্র একটি ধুর্তি। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। প্রশস্ত বুক। গলার কাছে টকটক করছে লাল রং। যোগীর লক্ষণ। সেই সময় তিনি কিন্তু ক্যানসারে ভুগছেন। তখন এত ওষুধ-বিষুধ বেরয়নি। দেহ-ব্যাধি এইসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন এক সাধক বসে আছেন। তক্তপোশে কিছুই পাতা নেই। কোথাও একটা বালিশও নেই। একেবারে সোজা খাড়া বসে থাকা। স্বভাবতই গম্ভীর। ঘরের মেঝেতে বসলুম। কিছুই পাতা নেই। দরজা দিয়ে ঢুকে আমি বাঁ পাশে বসেছি, আর দক্ষিণ দিকে ভারী সুন্দর একটি মেয়ে বই, খাতা, কলম নিয়ে বসে আছে। সাদা একটা তোয়ালেও রয়েছে। মেয়েটি মাঝেমাঝে উঠে কবিরাজজির পিঠ মুছে দিচ্ছে।

ভীষণ গরম। গঙ্গার দিক থেকে অল্প অল্প বাতাস এলেও প্রচণ্ড গরম। ঘরে কোনো পাখা নেই। পরে জেনেছিলুম, ওই মেয়েটি কঠিন কোনো বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছে। থিসিস জমা দেবে। কবিরাজজি মেয়েটিকে গাইড করছেন।

মাঝে মাঝে এমন সব বিষয় মেয়েটিকে বলছেন যার কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন বুঝি শৈবতন্ত্রের উপর কাজ চলছিল। আমি আর হরলালবাবু বসেই আছি। মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন। চোখ দুটি খুব বড়ো বড়ো। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে কেমন যেন ভয় ভয় করে। তলার দিকটা ঈষৎ লাল। আমাদের দিকে তাকালেও কিছু বলছেন না। হরলালবাবুকে ক্রিয়াযোগের অনেক কিছুই তিনি দিয়েছেন। সেই সম্পদ তাঁকে অত সুন্দর করেছে। গৃহস্থাশ্রমে থেকেও তিনি ছিলেন যোগী। এরই মাঝে কেউ একজন এসে এদিক-সেদিক দু'চারটে কথা বলার পর হঠাৎ বলে বসলেন, আপনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপর কিছু লিখুন না। কবিরাজজি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ওই বিষয়টা অনেক নীচের। আমার মন এখন গুরুর কৃপায় অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সেখান থেকে আর নামতে পারব না।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর একদিন খুব উৎসাহ নিয়ে সূর্যবিজ্ঞানের কথা বলতে লাগলেন। হরলালবাবু আমাকে ইশারা করলেন, অর্থাৎ ভালো করে শোন। একটি অলৌকিক ঘটনার কথা বললেন। এটি ঘটেছিল তাঁর জীবনে। বর্ধমানে গুরু বিশুদ্ধানন্দজির বাড়িতে। বিশুদ্ধানন্দজি ভারতের প্রাচীন সূর্যবিজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে গুরুপদে বরণ করার আগে গোপীনাথজি তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে বিশুদ্ধানন্দজির বাড়িতে গেছেন। তাঁকে ঘিরে অনেকেই বসে আছেন, গোপীনাথজিও

বসলেন। বসে বসে ভাবছেন ইনি কী আজগুবি কথা বলছেন। মানুষ নিমেষে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যেতে পারে। অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। ইচ্ছে করলে নিজের শরীর থেকে আগুন বের করতে পারে। একটা চারাগাছে ফল ফলাতে পারে। এ যেন জাদুকরের কারসাজি। মাদারিকা খেল। এখনও জানেন না কার কাছে গেছেন। এই যোগী যে কোনো মানুষের ভেতরে ঢুকে যেতে পারেন। মুচকি মুচকি হাসছেন, আর নবাগত এই তরুণটির মনের ভাবনা পড়ছেন।

যে ঘরে বসে আছেন, সেই ঘরের সামনে একটি দাওয়া। তারপরেই অনেকটা খোলা জায়গা, ফুলের বাগান। বিশুদ্ধানন্দজি গোপীনাথকে বললেন, বাইরের দিকে তাকিয়ে বল তো, ওটা কী ফুল? কবিরাজমশাই বললেন, গাঁদা ফুল। একটা ফুল তুলে নিয়ে এস তো। নির্দেশমতো একটি ফুল তুলে আনলেন। দাও আমার হাতে দাও।

বিশুদ্ধানন্দজি তাঁর হাতের তালুতে ফুলটি রেখে হাত মুঠো করলেন। কিছুক্ষণ পরে হাত খুলে একটি গোলাপ ফুল গোপীনাথজির হাতে দিলেন। তিনি অবাক। গাঁদা ফুল কি করে গোলাপ ফুল হল। বিশুদ্ধানন্দজি হাসতে হাসতে বললেন, সৌরশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেই বস্তুর রূপান্তর ঘটানো যায়। হিমালয়ের আড়ালে একটি জায়গা আছে, সেই জায়গাটি দেবভূমি। সাধারণ মানুষ সেখানে যেতে পারে না। ওখানেই আছে সূর্যমন্দির। সেখানেই শেখানো হয় সূর্যবিজ্ঞান। উপযুক্ত গুরুর কৃপা ছাড়া সেখানে যাওয়া যায় না। সূর্যই স্রষ্টা। বীজ থেকে গাছ, ফুল, ফল, মানুষের জীবন, স্বভাব, গায়ের রং, প্রজাপতির পাখনার কারুকার্য, ঘাসের সবুজ, একই উদ্যানে লাল, সাদা, নীল ফুল— সবই সূর্যদেবের মহিমা।

কবিরাজজি অভিভূত হলেন। পরে বিশুদ্ধানন্দজিকেই গুরু হিসেবে স্বীকার করলেন। গুরুর কথা বলতে বলতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উত্তরপ্রদেশের সেই মেয়েটি মাঝে মাঝে এসে মায়ের স্নেহে পিঠের ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছে। এই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে যে ক'দিন কাটিয়েছিলুম, সেই কদিনই ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।

এইবার ঘটল সেই অদ্ভুত ঘটনা। সকাল তখন ক'টা হবে, দশটা। গঙ্গার বুকে সূর্যের আলো, যেন আগুন জ্বলছে। তরঙ্গভঙ্গে ছিটকে ছিটকে উঠছে আলোর তির। বসে আছি। হঠাৎ কানে এল খসখস পোশাকের শব্দ। ভারী লম্বা পোশাক পরে কেউ যেন আসছেন। ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করল একটা লাল ঢেউ। টকটকে লাল। সারা ঘর এমন একটা সুগন্ধে ভরে গেল, যা বাজার চলতি কোনো সেন্টে পাওয়া যায় না। টকটকে লাল আলখাল্লা পরা একজন মানুষ। একমাথা ঘন কোঁকড়া চুল। কোনো মাথায় এত চুলও দেখা যায় না। মূর্তি কবিরাজজির সামনে এগিয়ে গেলেন। তাঁর হাঁটুতে দুবার চাপড় মারলেন। কপালে একটা চুমু খেলেন, তারপরে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন। কেউ কোথাও নেই।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কে এসেছিলেন? কবিরাজজি মৃদু হেসে বললেন, চিনতে পারলে না, সাঁইবাবা। আমি বললুম, তিনি তো পুতাপূর্তিতে থাকেন? কাশীতে কবে এসেছেন? মহামহোপাধ্যায় অদ্ভুত উত্তর দিলেন। বললেন, স্বশরীরেও আসতে পারে, অশরীরেও আসতে পারে। আমার মনে হয় তুমি যাকে দেখলে, তিনি তাঁর লৌকিক দেহ নিয়ে এখন দক্ষিণ ভারতেই

আছেন। অলৌকিক শরীরে আমাকে দেখে গেলেন। আমি বললুম, এই যে পোশাকের শব্দ, সুন্দর গন্ধ, পরিষ্কার একজন মানুষ, তাহলে কী দেখলুম, কিছুই না। গোপীনাথজি বললেন, তুমি কি পায়ের দিকে তাকিয়েছিলে? আমি বললুম, আজ্ঞে না।

তাকালেই দেখতে পেতে ওঁর পা দুটি ভূমি স্পর্শ করছিল না। কিছু মনে কর না, নিজের কথা একটু বলে ফেলছি। আমাকে দেখতে অনেকেই আসেন। আবার নাও আসেন। জিজ্ঞেস করলুম, আপনি সাধক, একজন সাধক অনেক কিছুই দেখতে পান। আমরা তো বিপরীত জগতের মানুষ, আমাদের দর্শন হবে কীভাবে! কী সুন্দর উত্তরই না তিনি দিলেন। প্রাণ ভরে গেল। বললেন, সঞ্জীব, 'একেই বলে সাধু-কৃপা।'

১৭ পৌষ ১৪১৬, ২ জানুয়ারি ২০১০

pathagar.net

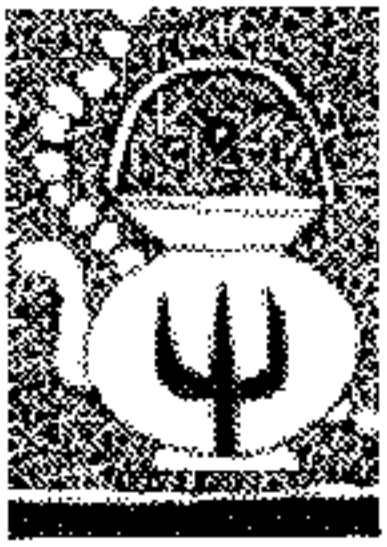

হঠাৎ দেখি চেয়ারে গৌরিদা, তারপরই নেই, টেবিলে শুধু শ্বেত শঙ্খ

কলকাতায় ফোর্ড ফাউন্ডেশন এল প্রচুর ডলার নিয়ে। ফাউন্ডেশন কলকাতার বস্তি উন্নয়ন করবে। প্রথমেই কাজ শুরু হল মুরারীপুকুর বস্তিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে সেখানে চালান করে দিলেন। এক আমেরিকান দম্পতি ডিরেক্টর। তাঁদের নাম মিঃ অ্যান্ড মিসেস এসভেরিয়া। অক্সফোর্ড থেকে এলেন ইকনমিস্ট ড. রোজেন। আর আমরা কয়েকজন। এন্টালি সি আই টি রোডে নতুন একটা বাড়ির দোতলার পুরোটাই তাঁরা ভাড়া নিয়েছিলেন। সারাদিন বস্তি অঞ্চল এফোঁড়-ওফোঁড় করি তথ্য সংগ্রহের জন্য। বিকেলবেলায় সি আই টি রোডের অফিসে ফিরে এসে রিপোর্ট লিখি। তারপর সেই রিপোর্ট একটা মিটিং-এ পড়ি, আলোচনা হয়। তারপর প্ল্যান তৈরি হবে, পরে মাস্টার প্ল্যান।

সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। কলকাতার জনজীবনের

বিষাক্ত, রক্তাক্ত ছবি। বাঁচার তাগিদটা মানুষের জীবনে কত প্রবল, তা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। এইসব অভিজ্ঞতাও লিখতে হত। ভাদ্র মাসের প্রখর রোদে ঘুরে ঘুরে মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেল। শুরু হল পেটের গোলমাল। একদিন অফিসে মাথায় হাত দিয়ে একপাশে বসে আছি। মিসেস এসভেরিয়া পাশে এসে কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল মাই ইয়ং ফ্রেন্ড? আমি বললুম, পেট। তিনি হা হা করে হেসে বললেন, যে কলকাতায় বিষ্ণুচরণ ঘোষ আছেন, সেই কলকাতার ছেলের পেটের সমস্যা। চল তোমাকে আজই, এখনই তাঁর কাছে নিয়ে যাই।'

জীবনে প্রথম আমেরিকান ফোর্ড গাড়িতে চাপলুম। পাশে এক স্নেহময়ী, মমতাময়ী বিদেশিনী। এই আমার যোগের জগতে প্রবেশ। ঘোষ পরিবার হল যোগের পরিবার। এই বাড়ি থেকেই বেরিয়েছিলেন স্বামী যোগানন্দ। আমেরিকায় তিনিই প্রথম ভারতীয় যোগ প্রচার করেন। প্রতিষ্ঠা করেন 'যোগদা মঠ', সে অন্য কথা।

এই যোগাযোগের ফলেই আমার সঙ্গে দু-জনের ঘনিষ্ঠতা হল। একজন বিখ্যাত যোগী বুঢ়্ঢা বোস আর একজন সুখ্যাত ডাক্তার গৌরশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। আমাদের সকলের গৌরিদা। তিনি জার্মানিতে ছিলেন। জার্মান ভাষায় পারদর্শী। কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনে জার্মান ভাষা শেখাতেন। জার্মান ভাষায় ডাক্তারি বই লিখেছিলেন, যা ওদেশে পাঠ্যপুস্তক হয়েছিল। বিষ্ণুচরণ ঘোষের হাতে তৈরি 'যোগী'। 'যোগী' মানে যোগাসনে অসীম দক্ষতা। কমল ভাণ্ডারি, মনোতোষ রায়, প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরিদার সমসাময়িক। এঁদের সকলেরই গুরু প্রখ্যাত যোগী বিষ্ণুচরণ ঘোষ, যাঁর দাদা স্বামী 'যোগানন্দ'। বুদ্ধ বসু (বুঢ়্ঢা) এই

পরিবারের জামাতা। গড়পারের এই পরিবারটি একটি ইতিহাস।

আমার সঙ্গে গৌরিদার যখন দেখা হল, তখন তিনি ডানলপের কাছে একটি আশ্রম করেছেন, আশ্রমটির নাম 'জয়ন্তী মাতা-আশ্রম'। সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করছেন। তাঁর গুরু ছিলেন 'রামঠাকুর'। পরমগুরু হলেন 'নীলঠাকুর'। জানি না ভুল হল কি না! রামঠাকুরের শিষ্য নীলঠাকুর না নীলঠাকুরের শিষ্য রামঠাকুর! গৌরিদার কাছে অলৌকিক শক্তিধারী রামঠাকুরের কথাই শুনেছি। গৌরিদা তাঁর সাধনার কথা বলতে গিয়ে রামঠাকুরের প্রসঙ্গ বারে বারে আনতেন, বলতেন, 'গুরু আমার জীবনের সমস্ত পাশ কেটে দিয়েছেন। আমি তাঁর কৃপায় জীবন ঘিরে যে অতিজীবন আছে, তার স্বাদ পেয়েছি। এখন আত্মদর্শনের চেষ্টা। আমি যোগের চুরাশি রকমের আসন সহজেই করতে পারি। শীর্ষাসন ও তার বিভিন্ন ধরন আমার করতলগত। রাজযোগে প্রাণায়াম আমি আয়ত্ত করেছি। কুম্ভকে সারাটা দিন কাটাতে পারি। সাধারণ মানুষের চেয়ে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা অনেক কম। এসবই গুরু কৃপা। ইচ্ছে করলে তুমিও পারবে।' তোমাকে একটা কথা বলি— 'মানুষ একতলায় থাকলে যা দেখে একশো তলায় উঠলে আরও অনেক বেশি দেখে। আর অনন্তের কাছাকাছি উঠলে সে আর কিছু দেখে না, তখন সমাধি। জান তো, আমার ইষ্টদেবী হলেন জয়ন্তী মাতা— মা দুর্গারই একটি রূপ। দশমহাবিদ্যারই এক বিদ্যা। জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ষোড়শী, ধূমাবতী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা। তন্ত্রসাধকের শেষ সাধন হল ছিন্নমস্তা। নিজের রুধির নিজে পান করা। শ্যামা-সুধা-তরঙ্গিনী।

গৌরিদা যখন এইসব কথা বলতেন, তাঁর আশ্রমের

দোতলায় বসে তখন গা ছমছম করত। একদিন চেপে ধরলুম। তখন সন্ধ্যা শেষ হয়ে ওই নির্জনে রাত নামছে। একসময় ওই জায়গায় বিশাল হোগলা বন ছিল। মানুষ ভয়ে যেত না, ডাকাতের ভয়ে। তখনও শহর ওই অঞ্চলটিকে গ্রাস করেনি।

গৌরিদা বললেন, শোন, সাধনলব্ধ শক্তি কারোকে দেখাতে নেই। তবে, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তুমি ঠিক কোথায় কোন জায়গায় থাক আমি জানি না। তবে রাত দুটোর সময় তুমি আমাকে তোমার ঘরে দেখতে পাবে। তোমার ঘরের বর্ণনাটা আমি দিচ্ছি। দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা খুব খাড়া। ভাঙা ভাঙা। একপাল্লার একটি বিশাল দরজা। মোটা বার্মা কাঠ। কালো রং করা। তোমার ঘরে একটা শ্বেতপাথরের টেবিল আছে। দুপাশে দুটি চেয়ার। একটার হাতল আছে ; আর একটার নেই। তুমি একটা ওক্তপোশে শোও। বিছানার কোনো বাহার নেই। মোটা নেটের মশারি। ঘরে একটা দেওয়াল আলমারি আছে। তুমি জেগে থেকো না। আমি গেলেই তুমি জেগে উঠবে। আমি ওই হাতলছাড়া চেয়ারটায় বসব। আর একটা শব্দ করব যা তোমার ঘুমের ভেতর দিয়ে কানে পৌঁছাবে। সমুদ্রের ভাঙা ঢেউয়ের মতো।'

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। বাড়িটির নিখুঁত বর্ণনা। যেন বহুবার গিয়েছেন। গৌরিদা অদ্ভুত একটি কথা বললেন— 'মানুষ যেমন লটবহর নিয়ে বেড়াতে পারে, সেইরকম একেবারে কিছু না নিয়েও বেড়াতে পারে। এমনকী দেহ ছাড়াও বেড়ানো যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ইচ্ছা ও ইচ্ছার শক্তি। বাইবেলে পড়নি— Let there be light, and there was light। আমি বললুম, 'গৌরিদা' আপনার কাছে যা সহজ আমার

কাছে তা ভয়ংকর কঠিন। এমন কী অবিশ্বাস্য! তারপরে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'জীবন তো এই সবে শুরু করলে, দেখাটা বাড়লেই বুঝতে পারবে ভারতবর্ষ হল আধ্যাত্মিকতার দেশ। শঙ্করাচার্য্য যা করে গেছেন তা কি গল্পকথা? গৌতম বুদ্ধের সাধনা কি পণ্ডশ্রম! দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ কি শুধুই রসগোল্লা খেয়েছেন! স্বামী বিবেকানন্দ কি মিথ্যাবাদী!'

বাড়ি ফিরে এলুম, ক্যালেন্ডারটা একবার দেখলুম, অমাবস্যা। জানলায় ঝুলছে মিশকালো আকাশ। পাশের কালীবাড়িতে মধ্যরাতের আরতির ঘণ্টা শুরু হয়েছে। শুয়ে পড়লুম। চিৎ হয়ে শোয়াটাই আমার স্বভাব, মাথার ওপর মশারির চাল। মশারির বাইরে থইথই অন্ধকার। ঘুম আসতে দেরি হল না। যদিও জেগে থাকার চেষ্টা করেছিলুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ভুলেই গিয়েছিলুম গৌরিদা কী বলেছিলেন। পাশের ঘরে বাবা শুয়ে আছেন, তৃতীয় আর কেউ নেই। পিতা-পুত্রের সংসার। হঠাৎ দেখি হাতলহীন চেয়ারে গৌরিদা বসে আছেন। কোনো কথা বলছেন না। টেবিলের উপরে একটা কিছু রেখেছেন। তাড়াতাড়ি উঠে মশারির বাইরে বেরিয়ে এলুম। চেয়ার খালি। কেউ কোথাও নেই। ঘরে একটা সুন্দর গন্ধ আর শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর একটি শ্বেত শঙ্খ। এমন সুন্দর শাঁখ এ বাড়িতে ছিল না। কী হল বুঝতে বুঝতেই ভোর হয়ে গেল।

১৮ পৌষ ১৪১৬, ৩ জানুয়ারি ২০১০

তোমার খুব বিপদ, বাঁচতে হলে এই মন্ত্র জপ কর বলেই গৌরিদা অদৃশ্য

ডাঃ এস কে চ্যাটার্জি একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। সুচিকিৎসক গৌরিদার সঙ্গে যে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এটা আমি জানতে পারলাম অনেক পরে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের আর একটি পরিচয়, বৈষ্ণব ধর্ম ও শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। নিজে একজন সাধক, ঠিক সময় বুঝে তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। কখনও একা, কখনও বা সপরিবারে। সম্প্রতি তিনি শ্রীচৈতন্য সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। নতুন নতুন গবেষণা শুরু হয়েছে। মহাপ্রভুর সময়ের ও তাঁর পরবর্তী কালটিকে আরও ভালোভাবে জানা দরকার। এই কাজে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের খুবই উৎসাহ।

তাঁর কাছেই গৌরিদার আরও গভীর পরিচয় আমি জানতে পেরেছি। তিনি শুধু যোগাসন শিক্ষক ছিলেন না, ছিলেন মস্ত এক যোগী। এই যে ত্রৈলঙ্গস্বামী,

লোকনাথবাবা, সাধক বেণীমাধব দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করেছিলেন, প্রত্যেকেই প্রায় ২৫০ বছর সুস্থ শরীরে পৃথিবীতে কাটিতে গেলেন, এর পিছনে রয়েছে যোগের ক্ষমতা। গৌরিদার যোগের পদ্ধতিটা কী ছিল, সে তো জানার উপায় নেই। পূর্বোক্ত সাধকরা সকলেই বাতাসের উপর থাকতেন, শ্বাস কম খরচ করতেন। মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজিও এই বাতাস পথেই বিচরণ করতেন। একটানা আট ঘন্টা, ন-ঘন্টা কীর্তন করতেন। মাঝে মাঝেই একটি আঙুল নাকের কাছে এনে দেখে নিতেন, বাতাস কোন নাকে বইছে। এই যে দেহ ছেড়ে আর একটা জায়গায় চলে যাওয়া, সে যত দূরই হোক না কেন, এরই নাম ক্রিয়াযোগের পথে পাওয়া 'সিদ্ধাই'। শ্রদ্ধেয় শ্যামাচরণ লাহিড়ি মহাশয়ের কথা আমরা জানি। তাঁর কাছে এসব ছিল অতি সহজ ব্যাপার। গৌরিদাকে বলেছিলাম, 'এই শক্তিটি পেতে গেলে আমাকে কী করতে হবে?' তিনি বলেছিলেন, 'সাধনা'। রাজযোগ প্রাণায়ামের চূড়ান্ত অবস্থায় শরীর পালকের মতো হয়ে যায় হালকা, তখন অন্তর পুরুষ ইচ্ছামতো দেহের ভেতরে আবার দেহের বাইরেও থাকতে পারেন।'

ডাঃ চ্যাটার্জি তাঁর মেয়েকে নিয়ে রোটাংপাসে গিয়েছেন। ১৯৯৪ সাল। যেমন হয়, চতুর্দিকে বরফ। আকাশ পরিষ্কার, ঝড়-বাদল নেই। কোথাও কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। পরেরদিনই তিনি মানালি হয়ে কলকাতায় ফিরবেন। হঠাৎ রাতের বেলা তাঁর ধর্মশালার ঘরে একটা আলো খেলে গেল। পরক্ষণেই দেখলেন গৌরিদা দাঁড়িয়ে আছেন। গৌরিদা বললেন, 'তোমার তো খুব বিপদ, বেঁচে ফিরবে কী করে?' ডাঃ চ্যাটার্জি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এখানে?' গৌরিদা বললেন,

'ও প্রশ্নে দরকার নেই। যদি বাঁচতে চাও তো সারারাত এই মন্ত্রটি জপ কর।' কথা শেষ, গৌরিদা অদৃশ্য। ডাঃ চ্যাটার্জি ঘরের বাইরে বেরিয়ে চারপাশ খুঁজে এলেন। নিস্তব্ধ থমথমে রাত। বাতাসে শিসের শব্দ। চতুর্দিকে বরফ। নানা আকার-আকৃতি। ফিরে এলেন ঘরে। কী হল কিছুই বুঝতে পারলেন না। যেন টেলিভিশন দেখলেন। বসে বসে মন্ত্র জপ করতে করতে একসময় ভোর হল। গাড়ি এল। মানালির দিকে যাত্রা শুরু হল। হঠাৎ দুর্যোগ, চতুর্দিক অন্ধকার। ১৮০ মাইল বেগে বাতাস বইছে। রাস্তাঘাট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মৃতের চাদরের মতো সব সাদা। গাড়ি যাচ্ছে, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে, চালকও জানেন না। থামার উপায় নেই। তাহলে গৌরিদা যা বলেছিলেন, সেটাই ঘটতে চলেছে। বরফ চাপা পড়ে মৃত্যু। আবার জপ শুরু করলেন। আবার আলো। উলটোদিক থেকে একটা আর্মি ট্রাক আসছে। সেই গাড়িটি পথ আটকে দাঁড়াল। নেমে এলেন একজন মেজর। খুব রাগের গলায় বললেন, 'গাড়ির চালক কে? এদিকে কী মরতে যাচ্ছিস?' ডাক্তারবাবুকে বললেন, 'নেমে আসুন।' অতি সাদাসিধে ভালোমানুষ ডাঃ চ্যাটার্জি। মেজর বললেন, উঠে পড়ুন এই গাড়িতে। এই পথে আমার আসার কথা নয়। কিন্তু এসে গিয়েছি। ভগবান মানেন?'

ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন, 'মানি। খুব মানি।'

'দেখেছেন কোনোদিন?'

'বহুদিন ধরে দেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু রুগি ছাড়া কিছুই দেখতে পারছি না। আমি একজন কলকাতার ডাক্তার।' মেজর বললেন, 'একটু আগে আমি বোধহয় ভগবানকেই দেখেছি। আমার গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে বললেন, go this way, there is a man in danger with his

daughter.' এই ভয়ংকর আবহাওয়ায় বাঙালি পোশাকে একজন মানুষ বরফে দাঁড়িয়ে আছেন। পরমুহূর্তেই আর নেই। কে তিনি ?' ডা: চ্যাটার্জি বললেন, 'উনিও একজন ডাক্তার।' Is he dead? আমি কি তাঁর ভূতকে দেখলাম ? 'He is very much living, কলকাতার আশ্রমে বসে আছেন।'

মেজর সাহেব বললেন, 'তোমরা এইসব খুব বিশ্বাস করো।' 'এখন থেকে আপনিও বিশ্বাস করবেন।' জায়গায় জায়গায় পথ নিশ্চিহ্ন। আর্মি ট্রাক বরফ কেটে কেটে এগিয়ে চলল মানালির দিকে। ডা: চ্যাটার্জি রাত ১টার সময় মানালি পৌঁছালেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজির প্রিয় শিষ্য কুলদারঞ্জন ব্রহ্মচারীজির জটায় একটি সাপ থাকত। কাউকে কিছু বলত না। গৌরিদা তাঁর আশ্রমে সরু লম্বা একটি ঘরে থাকতেন। রেলগাড়ির বাঙ্কের মতো ছোট্ট একটা শোওয়ার জায়গা। ঘুমোতে ঘুমোতে পাশ ফিরলেই পতন। হাতে সবসময় কোনো না কোনো বই। পড়ার যেন শেষ নেই। গৌরিদারও একটা সাপ ছিল। আমাকে বলেছিলেন, 'কোনো ভয় নেই। সাপ হল কুণ্ডলিনী শক্তি। কোনো না কোনোভাবে সাধকের কাছে আসে।' আমি বললাম, 'যদি একবার দেখতে পাই!' গৌরিদা বললেন, 'দেখে কাজ নেই।' সেরূপ দেখলে নেশা ধরে যাবে। শ্বাসের নেশা। প্রাণায়ামের নেশা। জান তো, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর থেকে সময় সময় একটা আলো বেরত। অন্ধকার পঞ্চবটী আলোকিত হয়ে যেত। তাঁর শরীরটা একটা স্ফটিকের মতো হয়ে গিয়েছিল। তখন মা কালীকে কেবলই বলতে লাগলেন, মা এসব কী করছ। কোনো লোক যে ভয়ে কাছে আসবে না। তুমি চাপা দিয়ে দাও, চাপা দিয়ে দাও। দেখ তীব্র সাধনে

এমন ঘটনা ঘটে। তিনি শ্যামপুকুর বাটিতে অসুস্থ, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে পুজো দেখতে গেলেন। সবাই দেখলেন ঠাকুর একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

গৌরিদা আমাকে অনেক কিছু দিতে চেয়েছিলেন। আমার একটা খাতায় নিজে হাতে নানা নির্দেশ লিখে দিয়েছিলেন। ভগবান কৃপা করলে কী হবে, মানুষ যদি তার মর্যাদা দিতে না পারে।

১৯ পৌষ ১৪১৬, ৪ জানুয়ারি ২০১০

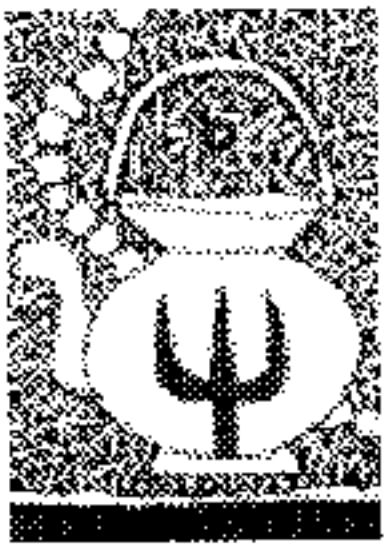

‘একি তুমি এখানে!’ প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে বেড়াচ্ছি

তখন পুলিশ কমিশনার কে ছিলেন মনে নেই, কিন্তু তাঁর ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সঙ্গে জার্নালিজম পড়তেন। ভীষণ ভালো ছেলে, মিশুকে, আমায়িক। একদিন আমাকে বললেন দ্যাখ, কাল অমাবস্যা। আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি। প্রথমে একটু ভয়ভয় লাগবে, আমারও লেগেছিল। কিন্তু পুরো জায়গাটায় সাধনা গমগম করছে। পা রাখলেই কীরকম একটা অনুভূতি হয়। কিন্তু সারারাত থাকতে হবে। আমি বললুম, সে কোনো ব্যাপার নয়, রাত জাগায় আমার ভয় নেই, বরং রাতে আমি জেগে থাকতে ভালোবাসি। আমি যেখানে থাকি, তার কিছুটা দূরে স্বামী সত্যানন্দের আশ্রম। সেখানে এক বড়ো সাধিকা থাকেন, তাঁর নাম সতীমা। গঙ্গার ধারের নাটমন্দিরে সাধিকারা সারারাত জপ করেন। তিনটে পাশই খোলা। পশ্চিমে গঙ্গা, পরপারে বেলুড় মঠ। সাধনভজনের শ্রেষ্ঠ জায়গা।

সতীমা আমাকে বলেছেন, 'রাত দুটোর সময় বাতাস ঘুরে যায়। পৃথিবীটা যে নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে, ধ্যানের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে তা বেশ বোঝা যায়। তুই যদি এখানে একদিন সারারাত জপধ্যানে বসিস, তাহলে কত কী যে দেখতে পাবি, শুনতে পাবি, তার ইয়ত্তা নেই। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের উদ্যানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব অভিজ্ঞতা ও দর্শন হয়েছিল, তা এখানেও হতে পারে। কিন্তু সাধনা করতে হবে। আমি একদিন ঠাকুরের মতোই দেখলাম, গঙ্গার জল থেকে মহাপ্রভু সংকীর্তনের দল নিয়ে উঠলেন। হরিনাম করতে করতে গেটের দিকে চলে গেলেন। আর একদিন দেখলাম, একশো আটটা প্রদীপ বাতাসে ভাসতে ভাসতে বেলুড় মঠের দিক থেকে এই আশ্রমে দিকে আসছে। শিখাগুলো একটুও কাঁপছে না। মাঝে মাঝে এইরকম একটা অনুভূতি হয় যেন পৃথিবী শ্বাস ফেলছে।

জায়গাটার নাম নিমতা। আমি ও আমার বন্ধু রাত আটটার সময় একটা আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলুম। নির্জন, নিরিবিলি, অনেকটা জায়গা। সবটাই প্রায় বেড়া দিয়ে ঘেরা। একটাই একতলা কোঠা বাড়ি। বাকি সব চালা। শীতের রাত, মাটি থেকে একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠছে। মাঝে মাঝে যখন বাতাস ছাড়ছে, তখন শরীর কেঁপে উঠছে। ঢোকার মুখ থেকেই দেখলুম অনেকটা দূরে একটা শামিয়ানা। সেখানে অনেক লোকের ভিড়। আলো জ্বলছে। সেখানে আলো খুব ঘন, তারপর গোটা এলাকাটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এক পাশে তিন-চারখানা দামি মোটর গাড়ি পার্ক করা। পরে জেনেছিলুম, অনেক বড়ো বড়ো লোক, মন্ত্রী, ডাক্তার, সরকারি কর্মচারী এখানে অমাবস্যার রাতে আসেন।

আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষ ওই বৃহৎ যজ্ঞে কেন এল, কার আকর্ষণে এল— সেটা বুঝলুম শেষ রাতে। সারারাত ধরে কালীপুজো হল। মায়ের দিকে তাকিয়ে আসনে বসে আছেন সাধক। আমি পিছন দিক থেকে তাঁকে দেখছি। মায়ের মূর্তি মনে একটা ভয় জাগাচ্ছে। অন্যান্য জায়গায় মাকে যেমন দেখি— হাতে খড়্গ থাকলেও মুখে মধুর হাসি। এই মা সেরকম নন। এঁর আলাদা তেজ। দুটো চোখে আলাদা জ্যোতি। ত্রিনয়নে কী লাগানো হয়েছে, বুঝতে পারলুম না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন আলো ঠিকরে আসছে, তাতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

রাত ক্রমশ ভোরের দিকে এগচ্ছে। তিনি একভাবে পুজো করে যাচ্ছেন। শরীর যেন পাথরে তৈরি। হঠাৎ তিনি আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন, পূজার স্থানের গণ্ডি ছেড়ে সকলের সমস্ত রকম স্পর্শ বাঁচিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। হাতে একটা মাটির পাত্র। হনহন করে এগিয়ে চললেন উত্তরের দিকে। আমরা যেখানে ছিলুম, সেখানেই রইলুম, কেবল শুনতে পেলুম তাঁর কণ্ঠস্বর। কাকে যেন ডাকছেন, আয় আয়। অন্ধকার আকাশ, চারপাশ নিস্তব্ধ। তারারা সব বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত। একটা হুটোপুটির শব্দ হল। দূর থেকে দেখছি পুরো জায়গাটা প্রথমে ঘন কালো হয়ে গেল, তারপর নড়তে লাগল। তিনি ফিরে আসছেন। সরল ঋজু চেহারা। টকটকে লাল কাপড়, গলায় লাল উত্তরীয়। রক্তাক্ষের মালার পাশে স্ফটিকের মালা। যখনই আলো পড়ছে, তখনই ঝলসে উঠছে। ফিরে এসে আসনে বসে পড়লেন। সারা ঘরে অদ্ভুত একটা গন্ধ।

আমার বন্ধু আমাকে ইশারা করল, ওঠ। আমরা

দুজনে একটু নির্জনে চলে এসে সেই জায়গাটির দিকে সাহস করে এগিয়ে গেলুম। খুব কাছে যাওয়ার দরকার হল না। তার আগেই দেখতে পেলুম, কমপক্ষে একশোটা শেয়াল। তারা মহাপ্রসাদ খাচ্ছে। আলো ফুটল।

পূজা শেষ, বসার ঘরে সেই সাধক এসে বসেছেন। আমার বন্ধু আমাকে তাঁর সামনে হাজির করতেই তিনি চমকে উঠে এই কথাই বললেন, 'একি তুমি এখানে!' আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলুম। এরপর তিনি একটিও কথা বললেন না। তাঁর ওই প্রশ্নটি নিয়ে জীবনপথে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি কোথাকার মানুষ, কী কারণেই বা এখানে— এই ভাবনাটি চিরকালের জন্য আমার মধ্যে ভরে দিয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। এই প্রশ্নের উত্তর আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। এই সাধকের নাম অনেকেই জানেন— নারান (নারায়ণ ঠাকুর)।

২০ পৌষ ১৪১৬, ৫ জানুয়ারি ২০১০

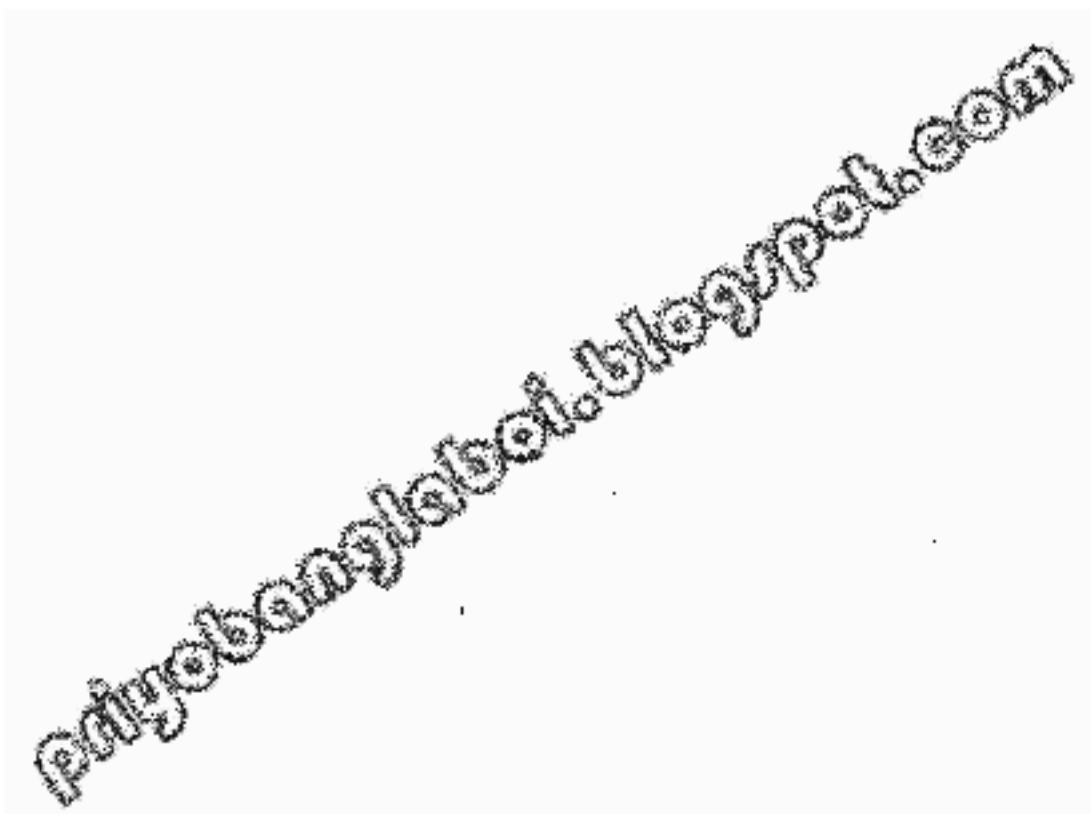

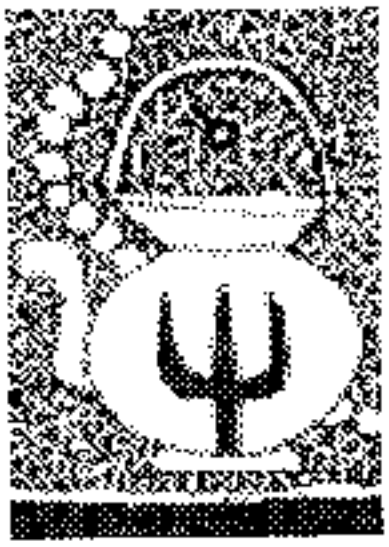

আয়নায় দেখতে গিয়ে দেখি যন্ত্রণাক্লিষ্ট বৃদ্ধার মুখ

আসানসোলের 'আপকার গার্ডেন্স' পশ এলাকা। কলকাতার 'নিউ আলিপুর'-এর মতো। সেখানে আমাদের এক আত্মীয় থাকেন। সুখী পরিবার। কোনো ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নেই। একটি মেয়ে একটি ছেলে প্রাণপণে লেখাপড়া করছে। মেধাবী। মানচিত্রের মাথায় উঠবেই উঠবে। বহুবার আসার আহ্বান জানালেও সুযোগ হয়নি। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের আদি পর্বের সঙ্গে আমার যোগ ছিল। তখন গঠনের কাল। বীরেন মহারাজ দায়িত্বে। শিল্প সঞ্চালনে রয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরেন মহারাজ পরে কানাডা মিশনে চলে গেলেন। অধুনা প্রয়াত।

সরকারি কাজে পুরুলিয়ায় গিয়ে যেমন তেমন একটা হোটেলে উঠেছি। হাড় কাঁপানো শীত। ঠাণ্ডার আক্রমণে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। বাজারে বীরেন মহারাজের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। দুজনেই অবাক। দেখামাত্র বিদ্যাপীঠের স্মৃতি

উথলে উঠল। কিছুক্ষণ সেইসব আলোচনা হল, পথের একপাশে রোদে দাঁড়িয়ে। বীরেনদা বললেন, হোটেলে থাকা চলবে না, এখুনি আমার ওখানে চল। সঙ্গে সঙ্গে পুঁটলি-পাটলা নিয়ে বীরেনদার সঙ্গে বিদ্যাপীঠে। বিশাল জায়গা। একটা গ্রাম বিশেষ। তখনও তৈরি হচ্ছে। কত কী হবে। তখন ধূ ধূ মাঠ। এখানে, ওখানে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা বাড়ি। শীতের রোদে ঝলমল করছে। বিহারী শীতের বাতাসে কাঁপুনি ধরছে। হাসপাতাল বাড়িটি সদ্য সমাপ্ত। বিদ্যালয় ভবন প্রায় শেষ। ঠাকুরের মন্দির তৈরি প্রায় শেষ। রামানন্দবাবুর অলংকরণ। থাকার ব্যবস্থা হল সদ্যসমাপ্ত সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে। তারপর গভীর চাঁদনী রাতে যা হল, স্পাইনচিলিং অভিজ্ঞতা। সে-কথা এখানে নয়। এখানের কথা পুরুলিয়ার অতীতকে স্পর্শ করে আসানসোলে।

আমাদের এই আত্মীয়টির বাড়িতে খানিক মজা আছে। বেশ বড়ো দোতলা বাড়ি। বাগান আছে পরিমাপ মতো। বড়ো গাছ, ছোটো গাছ, ফুলগাছ। এক সময় আরও ভালো ছিল, যখন পরিবারের সকলে জীবিত ছিলেন। শুরুটা ভালোই হয়, শেষটা নিয়েই সমস্যা। শুরু আর শেষ নিয়েই বাঙালির যত দার্শনিকতা। ফুচকা দেখে লাফাবে, পরক্ষণেই অম্বলের ওষুধ খাবে। বাড়িটার দোতলায় উঠতে হলে পাশের রাস্তায় বেরতে হবে। সেইদিক দিয়ে আরেকটা সিঁড়ি দোতলার বারান্দায় অর্থাৎ দোতলাটা একতলা থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি অতিথি। প্রথম রাত। ওই দোতলায় আমার শয়নের ব্যবস্থা হল। বড়ো বড়ো ঘর। লাল ঝকঝকে মেঝে। বিশাল একটা খাট। চারজন সহজেই শুতে পারে। একা আমি। গ্রিল দিয়ে ঘেরা চওড়া বারান্দা। একটা আম গাছ ঝুঁকে আছে। আমের সময় হাত

বাড়িয়ে একটা, দুটো আম পেড়ে আনা যেতে পারে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট গাছটাকে বেশ আলোকিত করেছে, যেন উৎসবের রাত। নির্জনতার উৎসব। একটা কিছু বেজে উঠলেই হয়। পাশেই কয়লা অঞ্চল। রেল শহর। মিশনারি স্কুল। রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল। ব্রিটিশ আমলে আসানসোলে অনেক দাপুটে সাহেব, মিশনারি আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছিলেন। রানিগঞ্জের রানি— বর্ধমানের মহারানি। ব্রাহ্মদের প্রভাব প্রতিপত্তি এদিকে খুব ছিল। এই অঞ্চলের অতীত ভাবলে মন কেমন করে। এক সময় চেঞ্জের জায়গা ছিল। কারমাটারে বিদ্যাসাগর মহাশয়। মধুপুরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গিরিডির ব্রাহ্মপল্লি। শিমুলতলার বাঙালি।

কিছুক্ষণ এইসব ভাবনায় বিভোর থাকার পর বারান্দা অভিযানে বেরলুম। ডানপাশে বহুদূর চলে গেছে। যেন No man's land, একেবারে শেষকালে ধাপ বেয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠেছে। বাথরুম ইত্যাদি। ফাঁকা ফাঁকা আরও অনেক ঘর। একটা গা ছমছমে পরিবেশ। আমি যে ঘরে থাকব, সেই ঘরের আলো পিচকিরির মতো বারান্দার খানিকটা জায়গায় এসে পড়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে জল পড়ে আছে। হইচই-শহর বেশ কিছুটা দূরে। রাত ক্রমশ থকথকে হচ্ছে। বোধহয় ঘোর অমাবস্যা।

হঠাৎ লক্ষ করলুম, দরজার সামনে বারান্দার যে অংশ, সেখানে একটা সুন্দর ড্রেসিং টেবিল। ওটা ওখানে কেন? ঘরের তো অভাব নেই। টেবিলটার কাছে গেলুম। আয়না থাকলেই মুখ দেখতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা দেখি তো, আজকে মুখটা কেমন দেখাচ্ছে! চমকে উঠলুম। আয়নায় যন্ত্রণাক্লিষ্ট এক বৃদ্ধার মুখ। এ মুখ কার? এ তো আমার মুখ নয়। কপালে হাত দিলুম। আয়নায় যে-মুখ ভাসছে, সে-মুখে কিছুই হল না। অদ্ভুত এক

দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে। শীর্ণ একটি মুখ। কেউ কোথাও নেই। মুখটা যেন আয়নায় আটকে গেছে।

আর কোনো কথা নয়। ঘরে এসে খাটে চিৎ। চোখ বুজিয়ে থাকাই ভালো। গবেষণার প্রয়োজন নেই। সন্দেহ নিরসনেরও দরকার নেই। হঠাৎ মনে হল কপালে কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে। বরফের মতো ঠাণ্ডা। শরীর ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে। চিন্তাশক্তি লুপ্ত। সকাল। ঝলমলে সকাল। দিনের আলোয় সাহস বাড়ে। প্রথমেই আয়নাটার সামনে গেলুম। আমার মুখ, কিন্তু এ কী? আমার কপালটা পুড়ে ঝুল কালো হয়ে গেছে। আর সামনের আমগাছের ডালে একটা মরা কাক ঝুলছে।

নীচে নেমে এলুম। প্রথমে ভেবেছিলুম, রাতের এই অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলব না। কিন্তু আমার কপাল। এল ফ্যামিলি অ্যালবাম। একটি ছবি। এই মুখ। সে এক লম্বা কাহিনি। ওই ঘরে বসে হোম করলুম। তারপর চণ্ডীপাঠ। বাড়ির প্রবেশপথের নিমগাছটি কেটে দিতে বললুম। কিন্তু প্রতিশোধ নিলেন সেই প্রবীণা। আচমকা মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় গৃহবধূ মাথায় আঘাত পেলেন। স্বপ্নে এলেন তিনি। বললেন, নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম, তোমার জন্য পারলুম না। তোমার ছোটো জাদুকে বলে দিও। আমি চলে যাচ্ছি তারাপীঠের মহাশ্মশানে।

এই বাড়ির কর্তা আসানসোলের এক সুপরিচিত মানুষ 'বেবোদা' নামে খ্যাত। ভালো নাম শৈলেন মুন্সি। সহধর্মিণী সোমা। পরোপকারী আত্মভোলা বেবোদার বাহন একটি মোটর সাইকেল, আর তাঁর আত্মার আত্মীয় হিমালয় ও হেসিয়ার।

২১ পৌষ ১৪১৬, ৬ জানুয়ারি ২০১০

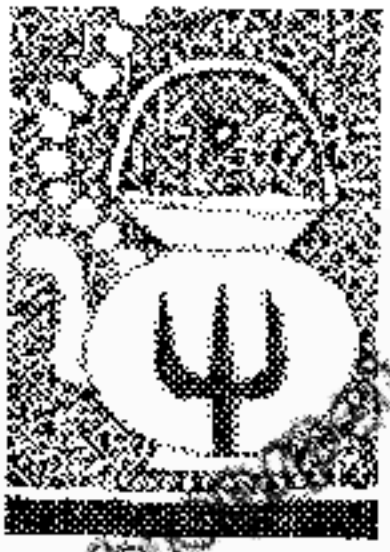

সিদ্ধ তান্ত্রিকের শেষ পুজো ছিন্নমস্তা, অমাবস্যায় রক্ত দিয়ে মায়ের পুজো করব

অনেকদিন আগে যুগান্তর পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছিল— গণপতি ম্যাজিশিয়ান এখনও জীবিত আছেন। যশ, খ্যাতি, ম্যাজিক— সব ছেড়ে দিয়ে তিনি এখন সিরিটি শ্মশানে একটি কুঠিয়ায় আছেন। মহা তান্ত্রিক। অনেকে জানতেন তিনি নিরুদ্দিষ্ট। অনেকটা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই। আমাদের বাড়ির কাছে কাশীনাথ দত্ত রোডে তিনি থাকতেন। সেখানে অনেকটা জায়গা নিয়ে একটি মন্দির করেছিলেন। এরপরে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। 'মিস্টিরিয়াস ডিস অ্যাপিয়ারেন্স' তখনকার বিখ্যাত স্টেটসম্যানে এইরকমই একটা হেডিং ছিল।

গণপতি একজন সেরা জাদুকর। সারা ভারতে তাঁর নাম। অনেক আধুনিক খেলা দেখাতেন। হুডিনির সমগোত্রীয়। আমাদের পূর্ব পুরুষদের মুখে তাঁর নাম অনেক শুনেছি। বিশ্ববিশ্রুত জাদুকর পি সি সরকারের

কিছু আগে বা সমসময়ে গণপতি এই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কোথাও তাঁর কোনো জীবনী আছে কি না জানি না।

একদিন অফিসে বসে আছি, এমন সময়ে আমার এক শিল্পী বন্ধু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে— পড়েছিস, গণপতি বেঁচে আছেন। একটু জিরিয়ে নিয়ে প্রস্তাব দিল আজই, এখুনি আমরা শ্মশানে যাব। সেই প্রথম সিরিটি শ্মশানের নাম শুনলুম। জিজ্ঞেস করলুম, সেই শ্মশান কোথায়! তখন কলকাতায় তিন নম্বর বলে একটা বাসরুট ছিল। সরকারি। সে অনেকদিন আগের কথা। এই বাসের শেষ স্টপেজে নেমে কিছুটা হাঁটলেই আদিগঙ্গার তীরে ভয়ংকর একটা শ্মশান। অনেকটা তারাপীঠের মতো।

যখন আমরা দুজনে সেই জায়গায় পৌঁছলুম তখন প্রায় সন্ধ্যা। নির্জন জায়গা, সম্পূর্ণ অচেনা। ভগবানের এমনিই কৃপা, হঠাৎই একটি শবযাত্রীর দল হরিধ্বনি দিতে দিতে আমাদের অতিক্রম করে গেল। আর্কিমিডিস ইউরেকা বলেছিলেন, সুব্রত লাফিয়ে উঠল— মিল গিয়া। আয় আমরা শবযাত্রী হয়ে যাই। তাহলে অবশ্যই শ্মশানে পৌঁছে যাব। দ্যাখ, মৃত মানুষও পথ দেখায়। সুব্রত এক মজার ছেলে। তার খামখেয়ালিপনার শেষ নেই। একবার সত্যনারায়ণ পার্কের কাছ থেকে একতাল সিদ্ধি আর লস্যি খেয়ে ডবলডেকারের দোতলায় উঠেছিল। ফুরফুরে বাতাসে কিছুক্ষণের মধ্যেই নেশা। বাস একটু কাত হলেই তার চিৎকার গেল গেল। শেষে পাবলিক তাকে গাঁজাপার্কের কাছে নামিয়ে দিল। সারারাত ফুটপাতে শুয়ে ওই একটা কথাই বলতে থাকল— গেল, গেল।

সুব্রত বলল— হরিবোল হরিবোল বল। হরিধ্বনি

দিতে দিতে শ্মশানে এসে গেলুম। এ নিমতলাও নয়, কেওড়াতলাও নয়। শ্মশানের জমি ঢালু হয়ে আদি গঙ্গায় নেমে গেছে। ওপরে যত রাজ্যের জঙ্গল, দু-একটা খড়ের চালা। সুব্রতর খুব আনন্দ। বললে, একেবারে তন্ত্রের জায়গা। সে আবার কায়দা করে শববাহকদের একজনকে জিজ্ঞেস করলে— মেসোমশাইয়ের কী হয়েছিল? ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন— মেসোমশাই নয় মাসীমা। যে ভদ্রলোক খই ছড়াচ্ছিলেন তাঁর ঠোঙায় তখনও কিছু খই ছিল। আমাকে বলল চাইব। আমি বললুম— খই কী করবি? তোর খিদে খিদে পাচ্ছে না, সুব্রত বললে।

লম্বা ধরনের একটা বাড়ি, চারপাশে চওড়া বারান্দা। কুঠিয়া বলাই ভালো। ঢোকার মুখে ডানদিকে ছিন্নমস্তার বিশাল এক মূর্তি। আকাশের আলো কমে এসেছে, আর ওই ছিন্নমস্তার মূর্তি— বেশ ভয় ভয় লাগছে। ছিন্নমস্তাকে প্রণাম করা যায় কি যায় না জানি না। বড়ো করে একটা প্রণাম করলুম। কিছু চাইলুম না। এইবার আশ্রমের ভেতরে ঢুকছি, দেখি বারান্দার ওপাশ থেকে এপাশে একটি মেয়ে আসছে। কুচকুচে কালো রং, পরনে ডুরে শাড়ি, এলো চুল। এতবড়ো কোমর ছাপিয়ে অনেকদূর নীচে নেমে গেছে, ঘন কালো চুল। আমরা জিজ্ঞেস করলুম— এখানে কি সাধু গণপতি থাকেন? মেয়েটি অদ্ভুত একটি দৃষ্টিতে তাকাল। কোনোরকম উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে যেন ভাসতে ভাসতে আর এক দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জুতো খুলে বারান্দায় উঠলুম। ঘরের দরজাটা ভেজানো। ভল ভল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। ধুনোর গন্ধ। দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করতেই দেখতে পেলুম একটি তক্তপোশের ওপর বিশাল এক মানুষ বসে আছেন। চারপাশে ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। আমাদের দুজনকে দরজার

সামনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গম্ভীর গলায় বললেন— ভেতরে এস। আর ঠিক সেই সময় আদিগঙ্গার অপর পারে এক সঙ্গে অনেক শেয়াল ডেকে উঠল। একটু দূরেই পড়পড় শব্দে চিতা জ্বলছে। পোড়া পোড়া গন্ধ। তিনি বললেন— বসো। প্রণাম করার জন্য এগতেই এক ধমক। 'একদম এগবে না। আমি কারও প্রণাম নিই না। আচ্ছা বলতে পার কে আমার এই সর্বনাশ করলে, কাগজে লিখে আমার শান্তি, স্বস্তি সব শেষ করে দিলে। কে চায় প্রচার।' সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারছি না— আপনিই কি গণপতি ম্যাজিশিয়ান। কী আশ্চর্য, হা, হা করে হেসে বললেন, আমিই গণপতি ম্যাজিশিয়ান। তারপর আরও অদ্ভুত ব্যাপার বললেন, সুব্রত। সুব্রত চমকে উঠেছে। নাম জানলেন কী করে।

গণপতি তখন বলতে শুরু করেছেন, 'ওই মেয়েটাকে বিয়ে করলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।' এখানে বলে রাখি সুব্রত তাঁর কথা শোনেনি। বিয়ের পরেই তার স্ত্রী বিছানা নিলেন। সারা জীবন সুব্রত সেবাই করে গেল।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সুশীলবাবুকে আমার প্রণাম দিও। তিনিই আমাকে সংসার ছাড়া করেছেন। তিনিই আমাকে তন্ত্রের জগতের সন্ধান দিয়েছিলেন। সিদ্ধ তান্ত্রিকের শেষ পূজা ছিন্নমস্তা। আগামীকাল শনিবার, অমাবস্যা আমি রক্ত দিয়ে মায়ের পুজো করব। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম— রক্ত কোথায় পাবেন? গণপতি বললেন, 'আমার শরীরেই তিন বালতি রক্ত আছে।' আমি খুব ভয় পেয়ে গেলুম। তারপর গণপতি বললেন, 'তোমার দাদুকে ধরে থাক। তা না হলে জীবন বরবাদ হয়ে যাবে।'

২২ পৌষ ১৪১৬, ৭ জানুয়ারি ২০১০

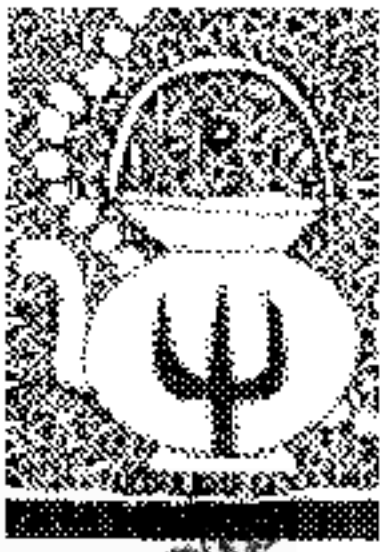

আমার কোনো নাম নেই। আমি মায়ের সন্তান, বলেই অদৃশ্য হলেন

priyobanglaboi.blogspot.com

সভা সহজে শেষ হয় না। শুরু হতেও দেরি, শেষ হতেও দেরি। সময়ের মা-বাপ নেই। যার একটা গান গাইবার কথা তিনি তিনটে নামালেন। প্রথম বক্তার ভাষণ যেন লাটাইয়ের সুতো। তিনবার তাঁর কানের কাছে ফুসফুস করা হল, কিন্তু তাঁর ফুসফুসে প্রচুর বাতাস। কেবলই বলছেন, আমার বক্তৃতা দীর্ঘ করব না, পরে অনেক বক্তা আছেন। মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ এলে আমার আর সময়ের জ্ঞান থাকে না।

সভাস্থল বর্ধমান। ফাঁকা মাঠে বিরাট প্যান্ডেল। রাত এগারোটায় যাত্রা হবে। কলকাতার দল। চলবে সারা রাত। লোক হবে তখন। ধর্মসভায় কারও মতি নেই। বক্তারা ভগবানকে ইটপাটকেলের মতো কঠিন করে ফেলেন। শ্রোতারা আহত হন। আমি আর আদ্যাপীঠের মহাসাধিকা ও পণ্ডিত ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি

টানা গাড়িতে। এই সাধিকা আমার মা। প্রথম পরিচয়েই বলেছিলেন, শোন, তুই আমার ছেলে। তুই আমার মুখাগ্নি করবি।

রাত সাড়ে আটটায় কোনোক্রমে মুক্তি মিলল। মাকে প্রণাম করার জন্য স্ট্যাম্পেড। তারপর গাড়ি গাড়ি করতে করতে রাত নটা। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে তখনও খোলেনি। ভাঙাচোরা দিল্লি রোড। অবশেষে গাড়ি এল। চালকের বয়েস বেশি নয়। তিড়িং বিড়িং স্বভাবের। তার ভাবভঙ্গি বিশেষ সুবিধার নয়। দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা শুরু হল।

ফটফটে চাঁদের আলোর রাত। মা বললেন, একটা গান ধর না। মা গান ভালোবাসেন। তালে খুব দখল। তবলা বাজাতে পারেন। সেতার শিখেছেন। তবে সংস্কৃত ও শ্রীমদ ভাগবত তাঁর প্রথম ভালোবাসা। এম. এ পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, সেদিন আর বাড়িতে গেলেন না, সোজা আদ্যাপীঠে শ্রদ্ধেয় জ্ঞান ভাইয়ের কাছে। অথচ বনেদি বড়োলোকের বাড়ির মেয়ে। অসম্ভব মেধাবী, তেজস্বিনী। কারও পরোয়া করেন না। ভীষণ সাহসী। স্বদেশিদের সঙ্গে যোগ ছিল। আদ্যাপীঠের সংস্কৃত গ্রন্থাগারটি তাঁর স্বপ্ন। অতুলনীয় সম্পদ সেখানে আছে। গবেষণার পীঠস্থান।

চাঁদের আলোয় চারপাশ ঝক ঝক করছে। লম্বা রাস্তা। জনপদ আসছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। চাষের খেত। জনপ্রাণী নেই। দূরে দূরে গাছপালা ঘেরা গ্রাম। জলাশয়ে স্থির জল কাচের চাদরের মতো পড়ে আছে। গাড়ির চালক ছেলেটি একটু নড়বড়ে। বেলা। মায়ের কোনো আক্ষেপ নেই। তিনি মুখে তিন তালের বোল বলে চলেছেন, আমার ভয় হচ্ছে উঁচু রাস্তা থেকে নীচের জমিতে না ফেলে দেয়। চড়া হেডলাইট জ্বেলে

উলটোদিক থেকে একের পর এক ট্রাক আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, এই আলো পড়লে দেখতে পাও ? সে বললে, না। আমি তখন চোখ বুজিয়ে থাকি। শুনে আমার পিলে চমকে গেল। মা বললেন, দাঁড়া, আদ্যান্তোত্র পাঠ করি।

আমাদের উদ্বেগ নিমেষেই শান্ত হল। গাড়ি একটা ছোটো ব্রিজে উঠে থেমে গেল। জিজ্ঞেস করলুম, কী হল ভাই ! চালক বললে, তেল ফুরিয়ে গেছে। মা বললেন, তেল ঢাল। ছেলেটি বললে, এদিকে কোথাও পেট্রল পাম্প নেই। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তাহলে কী হবে ? সে বললে, জানি না। এইবার মায়ের গলা চড়ল। জানি না মানে ? আমরা এখন যাব কী করে ? চালক বললে, কে কাল সকাল হলে বোঝা যাবে। মা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, তোকে আমার গুমগুম করে কিল মারতে ইচ্ছা করছে। চালক বললে, সে আপনি মারতেই পারেন, আপনি তো আমার মা। এমন তেঁটে ছেলে খুব কম দেখা যায়। রাত তখন অনেক। আমরা গাড়ি থেকে নেমে ব্রিজের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছি। চারপাশে চাঁদের আলোর জোয়ার। বাঁদিকে ধানখেতের মাঝখানে ছোট্ট একটা ঘর। ওখানে বোধহয় পাম্পসেট থাকে। কোথাও কোনো গ্রাম নেই, লোকজন তো দূরের কথা। মা বললেন, হ্যাঁরে এখানে কি ডাকাত আছে ! আমি বললুম, থাকতেও পারে। মা বললেন, কী আর নেবে।

ভীষণ উদ্বেগ, দক্ষিণেশ্বর এখনও অনেক দূরে। লরি চলাচলও কমে এসেছে। আমরা দুজনে মিলে আদ্যামাকে খুব ডাকছি। এমন সময় দূরে এক সাইকেল আরোহীকে দেখা গেল। আমাদের কাছে এসে গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলেন, কী সমস্যা ? মা বললেন, দেখ না বাবা, এমন বাঁদড়ের পাল্লায় পড়েছি, গাড়ি দাঁড় করিয়ে

দিয়ে বলছে তেল নেই। সেই মানুষটি জিজ্ঞেস করলেন— কোথায় যাবেন মা? আমরা আদ্যাপীঠে যাব। ভদ্রলোক ড্রাইভারকে বললেন, আমার সঙ্গে চল। দেখি কোথায় তেল পাওয়া যায়। ডিকি থেকে জেরিক্যানটা বের কর।

চালক ইতিমধ্যেই একটু ঘুমিয়ে নিয়েছে। সে অম্লানবদনে বললে, জেরিক্যান নেই। ভদ্রলোক ভীষণ রেগে বললেন, অয়েল মিটার না দেখে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিস। সঙ্গে একটা ক্যান নেই। তুই কীরকমের ড্রাইভার। ঠিক আছে চল। সাইকেলের সামনের বাড়ে ওঠ। সাইকেল বাঁদিকের রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ কোথাও নেই। কোন জায়গায় আছি তাও জানি না। রাত একটা।

মা বললেন, হ্যাঁরে, এই লোকটি হঠাৎ কোথা থেকে এল বলত। যেন আমাদের জন্যই এল। আমি বললুম, এইবার কী হবে বলুন তো! এই গাড়িটা তো আমাদের দায়িত্বেই পড়ে রইল। ভদ্রলোক ওদিকে কোথায় গেলেন তাও তো বোঝা যাচ্ছে না।

অনেকটা সময় চলে গেল। আমরা দুজনে অসহায়। অধৈর্য। বেশ খিদেও পেয়েছে। মায়ের চিন্তা আদ্যাপীঠের গেট বন্ধ। ঢুকবেন কী করে! এমন সময় দেখা গেল সেই সাইকেলটি আসছে। কী আশ্চর্য, ভদ্রলোক কোথা থেকে একটা ক্যান জোগাড় করেছেন। তেলও আছে। সাইকেল থেকে নামলেন। সাইকেলটা একপাশে কাত করে রাখলেন। মাকে প্রণাম করলেন। বের করলেন একটা বড়ো প্যাকেট। মায়ের হাতে দিয়ে বললেন, সেভাবে সেবা তো করতে পারলুম না। এই প্যাকেটে লুচি, আলুরদম আর মিষ্টি আছে। যেতে যেতে খাবেন। মা তাঁকে টাকা দিতে গেলেন। ভদ্রলোক ততক্ষণে

সাইকেলটা তুলে নিয়েছেন। তিনি বললেন, টাকা কী হবে ? আশীর্বাদ করুন। আমি আপনার সন্তান। চিনতে পারছেন না মনে হচ্ছে। আমার কোনো নাম নেই। আমি মায়ের সন্তান। যেদিক থেকে এসেছিলেন সাইকেল সেদিকে চলল। এইবার যা হল সেইটাই আশ্চর্যের। মানুষটি নিমেষে অদৃশ্য। মা ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলিস। ছেলেটি বললে, সে আমি বলতে পারব না। গাড়ি স্টার্ট নিল। যখন দক্ষিণেশ্বর ব্রিজে তখন ভোর হচ্ছে।

২৩ পৌষ ১৪১৬, ৮ জানুয়ারি ২০১০

priyobanglaboi.blogspot.com

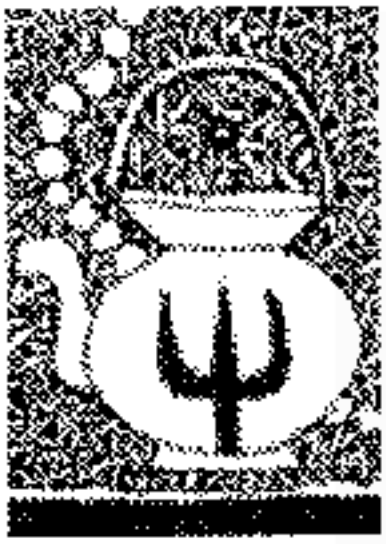

একটা ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল,
গাছের ডাল ভাঙার শব্দ হল

মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। গভীর থেকে গভীরতর কোমা। ডাক্তারবাবুদের চেষ্টার বিরাম নেই। শেষ জেনেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বাড়ির একটি ঘরকেই মোটামুটি নার্সিংরুম করা হয়েছে। একটা লোহার খাট, নার্সিংহোমে যেমন থাকে। আদ্যাপীঠের মহাসন্ন্যাসিনী বেলা মা এই খাটটি ম্যাটাডোরে চাপিয়ে নিজেই নিয়ে এসেছিলেন এই বাড়িতে। তখন রাত প্রায় দশটা। ম্যাটাডোরে খাট, খাটের ওপর ওই সাহসিনী বেলা মা। সেদিন যাঁরা জেগেছিলেন তাঁরা এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে অবাক হয়েছিলেন। শাস্ত্রের সত্য মিলিয়ে নিয়েছিলেন। শিষ্য যেমন গুরুকে সেবা করেন, প্রয়োজনে গুরুও সেইরকম শিষ্যের সেবা করেন। একটা লোহার খাটই শুধু এল না, ভালোবাসার সমুদ্রের একটি ঢেউ যেন আছড়ে পড়ল।

ফ্লুইড এবং ওষুধ ইন্টারভেনাস চলছে। পালা করে

ডাক্তারবাবুরা আসছেন। একজন সিস্টার ছায়াও রয়েছেন। নিউরোসার্জেন বিগ্রেডিয়ার টি কে রায় বারে বারে আসছেন। মিলিটারি ডাক্তার সহজে হাল ছাড়বেন না। সারা বাড়ির পরিস্থিতি থমথমে। মৃত্যুর ছায়ায় বসে জীবনের খেলা চলছে। ব্রেন টিউমারের রুগি। শেষ যে-কথা বলেছিলেন— সে বড়ো অদ্ভুত। আমাকে বললে, আমি চললুম, তুমি যাবে না। আমি বললুম, নিয়ে গেলেই যাব। সে বললে, সুটকেস দুটো নামাও। জিজ্ঞেস করলুম, কীসের সুটকেস। বললে, কর্মফলের। শেষ কথা।

ক্রমশ, ক্রমশ দিন এগিয়ে আসছে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে— Il omen, অর্থাৎ আতঙ্কজনক অশুভ ঘটনা। প্রথমে একদিন এক বিশাল কালো চকচকে কুকুর দরজা জুড়ে শুয়ে পড়ল। একমাত্র সেন্ট বার্নাডেরই এইরকম বড়ো চেহারা হয়। রাস্তার কুকুর নয়, কিন্তু কোথা থেকে যে এল বোঝা গেল না। এই পল্লিতে কারও বাড়িতে কুকুর নেই। সদর দরজা আটকে শুয়ে আছে। আমরা পেছনের দরজা ব্যবহার করছি। কুকুরটার চোখদুটো লাল ভাটার মতো। প্রায় সন্ধে পর্যন্ত কুকুরটা একভাবে শুয়ে রইল। তারপর হঠাৎ কোথায় চলে গেল। কেউই বলতে পারলেন না এল কোথা থেকে, গেল কোথায়। পরের দিন, তখন বেলা এগারোটা। আমাদের বাড়ির মাথার ওপর সারা আকাশ শকুনিতে ছেয়ে গেল। তখন অনেক শকুনি ছিল। এখন Extinct. প্রায় ঘণ্টাখানেক চক্কর মারল। তারপরে কোথায় চলে গেল।

তখন আমাদের দিন কাটছে এইভাবে— সকালে কোনোরকম খাওয়া, উদাস হয়ে বসে থাকা বা ঘুরে বেড়ানো। ভালো খবর তো কিছুই নেই। আর পালা করে রাত্রি জাগরণ। সেই রাত। অচেতন রুগি, ড্রিপ চলছে,

আর একটিও শিরা নেই, প্রায় সবই অদৃশ্য। নিডল ঢোকাতে ডাক্তারবাবুকে ধৈর্য হারাতে হচ্ছে। রুগির অবস্থা আরও নরম হয়ে আসছে। তাঁকে একটা ডেরিফাইলিন, ডেকাড্রন দেবার ব্যবস্থা চলছে। রাত প্রায় দেড়টা। আমি এবং আমার ভাই একটু বিশ্রাম করার জন্য দোতলার দক্ষিণের ঘরে মেঝেতে আধশোয়া। খুচখাচ কথা হচ্ছে। খবর এল কবজিতে আর নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। ওপর বাহুর সন্ধিস্থলে একটু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। মানুষ কীরকম মৃত্যুটাকে মেনে নেয়। আমরা দুজনে তখন উত্তর ভারত ভ্রমণের কথা বলছি। যে ঘরে বসে আছি সেই ঘরের পশ্চিম দিকের জানলা ঘেঁষে বেশ বড়ো একটা ফলসা গাছ। এদিকে, ওদিকে তখনও বেশ ফাঁকা। হঠাৎ একটা বীভৎস শব্দ হল। তিনতলার ছাদ থেকে একটা ভারী কিছু ফলসা গাছের ডালপালা ভেদ করে সিমেন্ট বাঁধানো প্রবেশপথের উপর পড়ল। আর ঘরের দক্ষিণ দিকের বড়ো জানলার গ্রিলের নীচের পার্টিটা চোখের সামনে ধনুকের মতো বেঁকে গেল। সিমেন্টের টুকরো ছিটকে এসে পড়ল এপাশে-ওপাশে। আমরা লাফিয়ে উঠলুম। কেউ কি ছাদে গিয়েছিল, সেখান থেকে ঝাঁপ মারল।

ঊর্ধ্বশ্বাসে নীচে নেমে এলুম। সেখানে একটা অন্য দৃশ্য। ডাক্তারবাবুর চোখেমুখে আতঙ্ক। কীরকম একটা ভয়ে কাঁপছেন। ছায়াদি বললেন, একটা ঝোড়ো হাওয়া ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বয়ে গেল। আর মটমট করে গাছের ডাল ভাঙার শব্দ হল। ডাক্তারবাবু আর পারলেন না। চেয়ারে বসে পড়লেন। এতটাই ভয় পেয়েছেন অজ্ঞান হয়ে গেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকত না। সারা বাড়ি, বাড়ির বাইরে, আশেপাশে বাড়ির ছাদ তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কোথাও একটা ইটের টুকরোও পাওয়া

গেল না। যে ভারী বস্তুটি নীচে পড়েছিল তারও কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। এতবড়ো একটা ঘটনা ঘটল কিন্তু কোথাও কোনো চিহ্ন রেখে গেল না। শুধু দোতলার জানলার গবরেটটা ভেঙে দিয়ে গেল। সারা বাড়িটা বাদ্যযন্ত্রের তারের মতো ঝাং শব্দে বেজে উঠেছিল। আমরা রুগির কাছে ফিরে এলুম। এটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না, পরিস্থিতি যেন বলতে চাইছে সময় হয়েছে নিকট এবার, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। নাড়ির স্পন্দন তখন গলার কাছে। এই মৃত্যু ওপর থেকে নীচে নামছে না, নীচে থেকে ওপরে উঠছে। প্রাণবায়ুর গতি হবে ঊর্ধ্বপথে। এমন মূর্খ আমি সেই মুহূর্তে এতেও আমি গৌরবান্বিত যে আমার স্ত্রীর মৃত্যু আধ্যাত্মিক ধরনের হচ্ছে। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা অভিজ্ঞ মানুষ, হতাশা মেশানো অদ্ভুত গলায় একটি কথাই বললেন— চলে গেল।

২৪ পৌষ ১৪১৬, ৯ জানুয়ারি ২০১০

pathagar.net

বিনা মেঘে বজ্রপাত

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যেদিন দেহ রাখবেন সেদিন সকাল এগারোটা, বারোটা নাগাদ বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়েছিল। সেই শব্দে মা, লাটু মহারাজ সবাই চমকে উঠেছিলেন। ঠাকুরের মেজদাদা রামেশ্বর কামারপুকুরে মারা গেলেন তখন গভীর রাত। কিছুটা দূরেই তাঁর বন্ধুর বাড়ি। তিনি বন্ধু রামেশ্বরের গলা পেলেন। বলছেন, আমি চললুম, তুই ওদের একটু খবর রাখিস আর রঘুবীরকে দেখিস। দরজা খোলার দরকার নেই কারণ আমাকে দেখতে পাবি না। কুকুরের সঙ্গে মৃত্যুর কি কোনো সম্পর্ক আছে? অবশ্যই আছে। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথে একটি কুকুর সঙ্গী হয়েছিল। আর কুকুরদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। কুকুর অশরীরী দেখতে পায়। তখনই তারা হায়নার মতো কাঁদতে শুরু করে। বোঝা যায় অমঙ্গল আসছে।

পুরাণে এইরকম অনেক বর্ণনা আছে। অমঙ্গলের আগাম ইঙ্গিত।

বছর ঘুরে গেল। মৃত্যু সয়ে এল। বাৎসারিক শ্রাদ্ধের দিনকয়েক আগে হুঁশিয়ারি এল। রাত দুটো, কয়েকজন দোতলায়, কয়েকজন একতলায়। গভীর ঘুম। হঠাৎ সারা বাড়ি কাঁপতে লাগল আর অদ্ভুত একটা আওয়াজ। সে আওয়াজটা এরকম হতে পারে— ভারী গলায় একদল মানুষ ওঁকার ধ্বনি করছেন। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী জেগে উঠলেন। সব আলো জ্বলল।

শুরু হল কারণ খোঁজা, যন্ত্রপাতি সব চেক করা হল। একটা খুব ভালো অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল। তাকে বাগানে ছেড়ে দেওয়া হল। সেই বীর অ্যালসেশিয়ান লেজ গুটিয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে খাটের তলায় ঢুকে পড়ল। কারা এসেছিল! কী কারণে এসেছিল! পরিবারের সদস্যরা বললেন— আমাদের মা মনে করিয়ে দিলেন আমার মৃত্যুর বয়স হয়েছে এক বছর। কাজ করতে ভুলো না।

২৪ পৌষ ১৪১৬, ৯ জানুয়ারি ২০১০

priyobanglaboi.blogspot.com

...প্রণাম করার জন্য নিচু হতেই ছোটোদাদু বললেন, মুখ দিয়ে কাশির সঙ্গে রক্ত বেরলেই টিবি হয় না। অন্য কারণও থাকতে পারে। সেই ছেলেটির চোখেমুখে ভীষণ একটা আশ্চর্যের ভাব। তিনি তখনও কিছু বলেননি। ছোটোদাদু বললেন, এখানে বস। যুবকটি কিছু বলতে চাইছিলেন। ছোটোদাদু বললেন, তোমার ভাবনাটা আমি বইয়ের মতো পড়তে পারছি। কথা বলে কোনো লাভ নেই। দ্যাখ, পৃথিবীর দুটো দিক— লৌকিক আর অলৌকিক। এই দেহটা নিয়ে যা জানতে পারি, তাকেই বলে লৌকিক। আর দেহের ভেতর যে সূক্ষ্মদেহ সে দেখে, তাকেই বলে অলৌকিক। ...

লালমাটি